SERVICE STATION.

সাজানো বাগান

VOLKART ... LIBRARY.
CALCUTTA

STATE CENTRAL LIBRARY
Calcutta

সাজানো বাগান

C.R1640

LIBRARY. * KOLKATA
CALCUTTA

মনোজ মিত্র

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
VIP Road, Calcutta

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

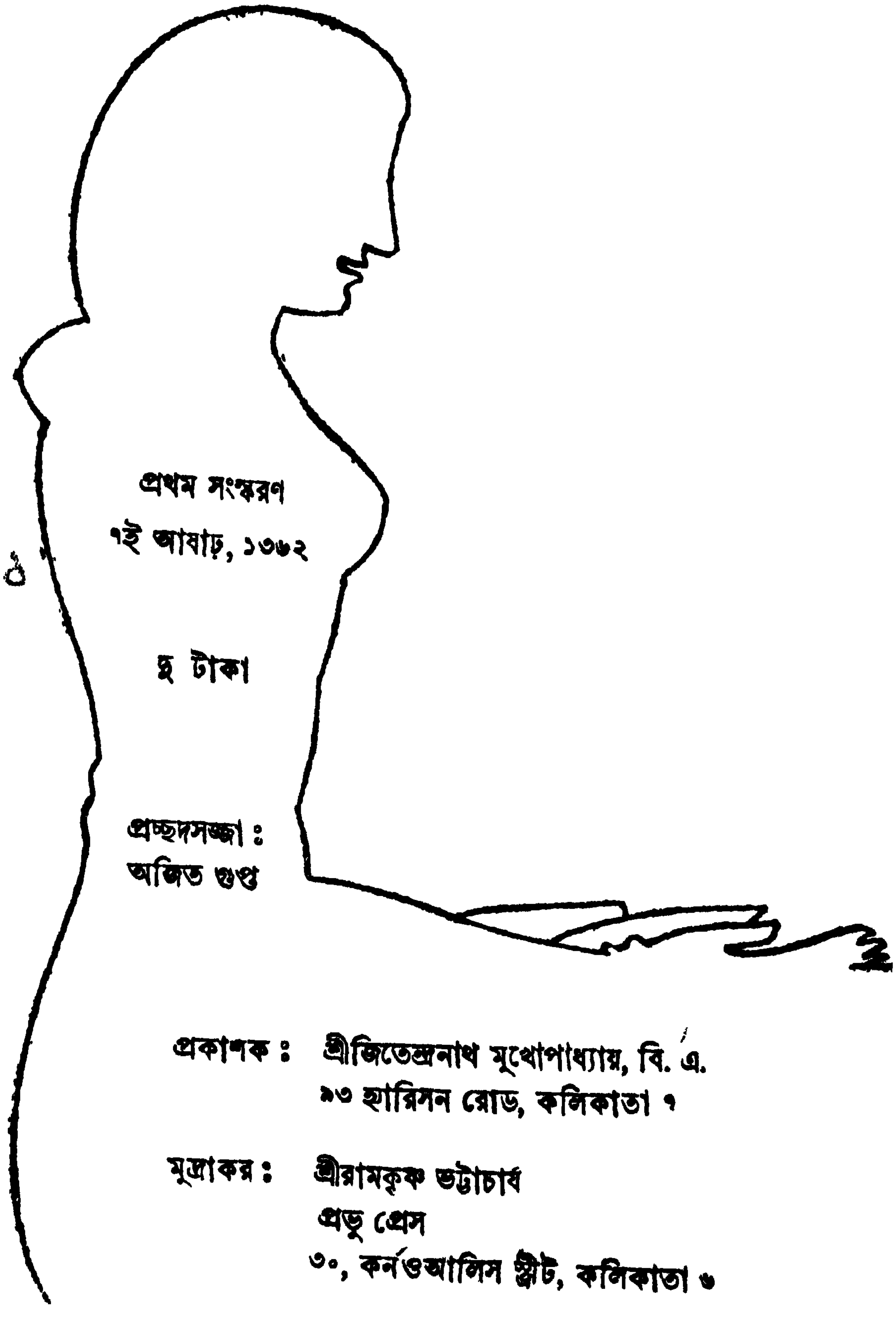

প্রথম সংস্করণ

৭ই আষাঢ়, ১৩৬২

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩ হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

STATE CENTRAL LIBRARY, WEST BENGAL
ACCESSION NO. ....
DATE ২৯.১২.০৬

উৎসর্গ

স্বর্গাদপি গরীয়সী আমার মায়ের

পুণ্য শ্রীপাদপদ্মে

—ধীরাজ

ভূমিকা

গল্পগুলি আমার বিভিন্ন বয়সের লেখা। অভিনেতা জীবনের স্বল্প অবসরে যখনই আত্মপ্রকাশের কোন তাগিদ অনুভব করেছি, সে তাগিদ কিছুটা মিটিয়েছি গল্প লিখে। গল্পগুলি এতোদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে অযত্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। এখন সবগুলি খুঁজে-পেতে একত্র ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেডের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার 'সাজানো বাগান' আমারই আত্মপ্রকাশের আর এক রূপ।

এই প্রকাশ সকল শ্রেণীর পাঠককেই যে তৃপ্তি দিতে পারবে এমন দুরাশা আমার নেই কিন্তু পাঠক সমাজের কিছু অংশ আনন্দ পেলে আমি নিজে পরিতৃপ্ত হবো।

পলকা সুতোর ঘুড়ি	...	১
জলের ডাক	...	২৫
তপোভঙ্গ	...	৩৭
রেয়াজুদ্দিনের গলি	...	৫০
শেষের দিক	...	৭১
সকল দুখের প্রদীপ	...	৮৬
একটি ছোট্ট মিথ্যেকথা	...	১০২
আমার সাজানো বাগান	...	১০৮

পলকা সুতোর ঘুড়ি

আকৃতি প্রকৃতি রুচি—কোনওটার সঙ্গে মিল না থাকলেও অলক্ষ্যে কোথায় যেন একটা ছোট্ট যোগসূত্র আত্মগোপন করে ছিল, নইলে অবিনাশের সঙ্গে এত দীর্ঘদিন বন্ধুত্ব আমার অটুট থাকতো না—একদিন না একদিন চিড় খেয়ে যেতোই।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম ভর্তি হয় অবিনাশ—তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই কি করে যে অতোখানি ঘনিষ্ঠতা হল—ভাবতেও অবাক্ লাগে। ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম ডানপিটে ছেলের দলে। মারামারি, দল পাকানো, পরনিন্দা এসব তো ছিলই, তাছাড়া লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, মেয়েদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ আলোচনা এও রীতিমত চলতো আমাদের দলে। মরালিস্ট ভাল ছেলের দল আমাদের বেশ ভয় করেই চলতো—আর পারতপক্ষে আমাদের বেঞ্চির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষতো না। স্বল্পভাষী গম্ভীর অবিনাশই ছিল এর একমাত্র ব্যতিক্রম। বেশ বুঝতে পারতাম—আমাদের এইসব আলোচনা ও মোটেই পছন্দ করতো না, তবুও মুখ ফুটে কোনদিন প্রতিবাদও করেনি বা আমার ঠিক পাশের সিট থেকে উঠেও যায়নি। ঠায় সিটে বসে নীচের দিকে চেয়ে লাল হয়ে ঘামতো ; আর নখ খুঁটতো, এতেও নিষ্কৃতি ছিল না, দুষ্টু ছেলের দল অবিনাশের নামের পাশে যুতসই বিশেষণ দিতে ছাড়ত না, যথা—ভিজেবেড়াল, বর্ণচোরা, দুষ্কর্মের পাদরী ইত্যাদি। একটা জিনিসে শুধু মনে মনে সবাই শ্রদ্ধা করতো ওকে, লেখাপড়ায় অসম্ভব ভালো ছিল অবিনাশ। প্রতি পরীক্ষায়

প্রথম বা দ্বিতীয় ; এর বাইরে যেত না—আর এইখানেই আমার সঙ্গে খানিকটা মিল ছিল ওর, এতো দুষ্টুমি করেও পরীক্ষার ফল খারাপ হত না।

অবিনাশের বাবা পাটনায় বড় চাকরি করতেন—রিটায়ার্ড হয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় প্রকাণ্ড বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা—আর এসবের একমাত্র উত্তরাধিকারী অবিনাশ। অবিনাশের পোশাকে-আশাকে, কথাবার্তায়, চাল চলনে ধারণাও করা যেত না যে ব্যাক-গ্রাউণ্ডে অত বড় একটা ঐশ্বর্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও জানতাম না—ওর সঙ্গে আলাপ হবার বছর দুই বাদে কি একটা উপলক্ষ্যে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। বাড়ী দেখেই তো চক্ষুস্থির—বালিগঞ্জে প্রায় এক বিঘের ওপর জমিতে বাগান ও বাড়ী। আমার হতভম্ব ভাব দেখে ও সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল। সেদিন থেকে অজান্তে কেমন একটা শ্রদ্ধাও এসে গেল ওর ওপর। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে নয়, ওর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ওপর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভাল বৃত্তি পেয়ে পাস করলো অবিনাশ। বৃত্তি না পেলেও ভাল নম্বর পেয়েই পাস করলাম আমি। আই-এ পড়তে ও ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে। আই-এসসি নিয়ে আমি ঢুকলাম আশুতোষে। ভাবলাম যোগসূত্র বোধ হয় এইবার ছিন্ন হল—হল না। প্রতি রবিবার বা ছুটীর দিনে অবিনাশ এসে হাজির হত আমার ছোট্ট বাইরের ঘরটিতে। ভাঙ্গা তক্তাপোশের ওপর পাতা ময়লা মাদুরটার এক পাশে চুপটি করে বসে আমাদের আলোচনা শুনতো, বেলা বেড়ে উঠলে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়িয়ে বলতো—চলি, আর একদিন আসবো। ওকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরতো—কিন্তু কেন যে ও আসে, চুপ

করে অতক্ষণ কেনই বা বসে থাকে—এর কোনও মীমাংসাই হতো না। এর পরের ঘটনাগুলো খুব সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। হঠাৎ পড়া ছেড়ে চাকরির চেষ্টায় কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। অবিনাশ কিন্তু সরস্বতীর দোরগোড়ায় ঠায় মাথা গুঁজে পড়ে রইল। আই-এ থেকে সুরু করে এম-এ, তারপর ল পাস করে তবে মুখ তুলে বহির্জগতের দিকে ফিরে চাইল। খবরটা শুনে প্রথমে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম—ঐ লাজুক মুখচোরা ছেলে উকিল হোল? কিছুদিন বাদেই ওর মুনসেফ হবার খবরটা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমার ডানপিটে বন্ধুবান্ধবের দল কে যে কোথায় ছটকে পড়ল বুঝতেই পারলাম না। অবিনাশ কিন্তু কলকাতায় থাকলেই নিয়মিত দেখা করে যেত। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম—আর কেন, এইবার বে-থা করে একটা আস্তানা বাঁধবার চেষ্টা কর, আর কতদিন এইভাবে ভেসে বেড়াবে। ভীষণ নারভাস হয়ে জবাব দিয়েছিল অবিনাশ—'বিয়ে? ওরে বাবা রে, ওসব আমার ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এইত বেশ আছি।' বলেছিলাম, 'কিন্তু তোমার বাবা মা, তাঁরা কিছু বলছেন না?' উত্তরে অবিনাশ ম্লান হেসে বলেছিল—'তাঁরা কর্তব্যের ত্রুটি কিছুই করছেন না, কিন্তু বিয়েটাত করব আমি।' এর কোনও জবাব খুঁজে পাইনি সেদিন।

এরপর বছর খানেক অবিনাশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। সরকারী চাকরিতে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল, তবু ওরই মধ্যে সময় করে ওর বাড়ীর ঠিকানায় দু-তিন খানা পত্র দিয়েছিলাম—জবাব পাইনি। আরও একবছর কাটলো—আমার জীবনের ওপর দিয়ে একটা মস্ত বিপ্লবের ঢেউ বয়ে গেল। সরকারের

চাকরি ছেড়ে বায়োস্কোপের অভিনেতা হয়ে ঢুকে পড়লাম অন্য এক জগতে। এই বিচিত্র জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে অবিনাশের মত ছেলের যোগসূত্র রাখা ও থাকা সম্ভব নয়, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওকে। হঠাৎ জেসিডি থেকে এই চিঠি পেলাম অবিনাশের, লিখেছে,—

ভাই,

ইচ্ছে থাকলেও অনেক দিন খোঁজ-খবর নিতে পারিনি, সেজন্য প্রথমেই মাফ চাইছি। হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছি, কাউকে বলতে পারিনি। জানি তুমি আজকাল ছবির কাজে খুব ব্যস্ত, তবুও যদি দুদিনের ছুটী নিয়ে একবার আসতে পার—তোমার বৌদি ও আমি খুব খুশি হব। রাতের গাড়ীতেই এস—ভোরে পৌঁছে যাবে। আমরা স্টেশনে থাকবো। ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমাদের অবিনাশ

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! এতদিন বাদে বিয়ে করেছে অবিনাশ, নিশ্চয় লভ্ ম্যারেজ, হনিমুন করতে গেছে শুকনো পাহাড়ের দেশ জেসিডিতে, আমি ফিল্মে কাজ করি জেনেও বৌ-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। অবাক্ হবার এতগুলো এলিমেণ্ট এক সঙ্গে কারো ভাগ্যে জুটেছে কিনা আমার জানা নেই।

সত্যিই সে সময় কাজের খুব চাপ, জোর স্যুটিং চলেছে, ছুটী পাওয়া এক রকম অসম্ভব। অন্য কেউ হলে গ্রাহ্য করতাম না কিন্তু এতদিন বাদে অবিনাশ! কৌতূহল চুপ করে থাকতে দিলে না। অতি কষ্টে দুদিনের ছুটী নিয়ে পরদিনই রাতের গাড়ীতে জেসিডি রওনা হয়ে পড়লাম।

২

ভোরেই জেসিডি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। অনুসন্ধানী চোখ দুটো দিয়ে সারা প্ল্যাটফর্মটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম না যাকে ভুল করেও অবিনাশের বৌ বলে মনে হতে পারে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু অবিনাশ আর ওর হাত ধরে দশ-এগারো বছরের একটি ফ্রক-পরা ফুটফুটে মেয়ে। গাড়ী থামতেই ছোট সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম। অবিনাশ বা আমি কিছু বলবার আগেই মেয়েটি এগিয়ে এসে বললে, 'আপনি ত দাদাবাবুর বন্ধু ? বায়োস্কোপ করেন। দেখেছি, দক্ষযজ্ঞ ছবিতে আপনিই তো শিব সেজেছিলেন ?' এতগুলো প্রশ্নের ছোট্ট একটি উত্তর দিলাম—হ্যাঁ। অবিনাশের দিকে চেয়ে বললাম—কে ?

মৃদু হেসে অবিনাশ বললে—আমার শ্যালিকা নিভা।

বললাম,—তোমার স্ত্রীর আসবার কথা ছিল না ?

অবিনাশ কিছু বলবার আগেই নিভা বললে—'আপনার সব ছবিই আমরা দুবার-তিনবার করে দেখি, দাদাবাবু কিন্তু কোন ছবি দেখে না, বলে ভাল লাগে না। মাগো, কি যে লোক ! আপনিই বলুন তো বায়োস্কোপ ভাল লাগে না ?' একটু বেশী কথা বলা অভ্যাস নিভার। অবিনাশকে বললাম—তোমার স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ করেনি ত ?

'না না সে সব কিছু নয়, মানে আসতে চাইলে না, লজ্জাটা একটু বেশী কি না, বললে,—তোমরা যাও আমি বরং রান্নাবান্নার যোগাড় দেখি।' প্রসঙ্গটা যেন চাপা দেবার জন্যই অবিনাশ তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বললে—'চল না—এগুনো যাক, এই তো কাছেই বাসা।'

স্টেশন ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। একটু গিয়েই সামনে বাঁ হাতের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বললাম,—'তা ভারতবর্ষে এত সব মনোরম জায়গা থাকতে এই রস-কস-হীন পাথুরে দেশ জেসিডিতে মধুযামিনী করতে এলে কেন?' বেশ বুঝতে পারলাম লজ্জায় লাল হয়ে গেছে অবিনাশ, প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'না না মধুযামিনী টামিনী নয়, বেরি বেরি'। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম—'বেরি বেরি?'

ম্লান হেসে বললে অবিনাশ—'হ্যাঁ, তোমার বৌদির আর আমার তুজনেরই। ডাক্তার বললে, অন্ততঃ মাস তুই-এর ছুটী নিয়ে কোনও শুকনো জায়গায় চলে যান। এই ছাখো না।' ডান পাটা বাড়িয়ে কাপড়টা উঁচু করে দেখালে অবিনাশ। দেখলাম সত্যিই পায়ের পাতা গোছা বেশ ফুলো। বৌদির স্টেশনে না আসবার কারণ খানিকটা বুঝলাম।

পাঁচ মিনিটের পথ—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। রাস্তা থেকে একটা উঁচু মাটির ঢিবি উঠে গেছে—তিন চারটে ধাপ উঠে গিয়েই সামনে পড়ে ছোট একটা উঠোন, উত্তর দিকে একতলা সারি সারি তিনখানা ঘর, সামনে সিমেণ্ট করা বারান্দা, উঠোনের দক্ষিণ দিকে রান্নাঘর, তার পাশে পাতকুয়ো, দেখে মনে হল বাড়ীটা আনকোরা নতুন। অবাক্ হয়ে চারদিকে চাইছি, আর ভাবছি। অবিনাশ এই বাড়ী নিয়েছে? ওদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে চাকর ড্রাইভারও এর চাইতে ভাল কোয়ার্টার্সে থাকে। নিভা চিৎকার করে রান্নাঘরে ছুটে গেল—'ও দিদি, তোমার দক্ষযজ্ঞের শিব এসেছে' পরক্ষণেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। বুঝলাম এই অতি উচ্ছ্বাসের জন্য তিরস্কার খেয়েছে নিভা।

আস্তে আস্তে অবিনাশের সঙ্গে প্রথম ঘরটায় ঢুকে পড়লাম।

বুঝলাম এইটেই বাইরের ঘর। এক পাশে তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা,—পাশেই একখানা নড়বড়ে টিনের চেয়ার। সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। টিনের চেয়ারটার ওপর সুটকেসটা রেখে তক্তাপোশের ওপর বিছানায় বসলাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমার এই হতভম্ব ভাব দেখে অবিনাশও বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। কিছু একটা বলতে হয়, তাই বললাম—'বাঃ দিব্যি ছোটোখাটো বাড়ীটা, মনে হচ্ছে তুমিই প্রথম ভাড়াটে।'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল অবিনাশ, তাড়াতাড়ি বললে,—'নাও, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি দেখি চায়ের কদ্দূর হ'ল। রকের ওপর দিয়ে গট গট করে চলে গেল অবিনাশ।

সুটকেসটা খুলে একটা লুঙ্গি বের করে পরলাম। জামা জুতো খুলে পাশের ছোট আলনাটায় রেখে দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি—এরই মধ্যে কে যেন রকের ওপর এক বালতি জল, সাবান, তোয়ালে সব গুছিয়ে রেখেছে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এসে বন্ধুস্ত্রীর প্রতীক্ষায় বিছানায় বসে আছি—একটা ছোট ট্রের ওপর চা, টোস্ট, ছোট দুটো ডিম সেদ্ধ, আর দুটো সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকলো একটি আধা বয়সী বিধবা মেয়েছেলে, ঘোমটায় মুখের বারো আনাই ঢাকা থাকলেও বুঝতে কষ্ট হয় না, যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। ভাবলাম বোধ হয় অবিনাশের দুর সম্পর্কে আত্মীয়া বা রাঁধুনী হবেন। প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গেলাম, তারপর তাড়াতাড়ি হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে সুটকেসটার ওপর রাখলাম। কোনও কথা না বলে ভদ্রমহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খিদেও বেশ পেয়েছিল—সুটকেস সমেত চেয়ারটা কাছে টেনে এনে বিছানায় বসেই অনশন ভঙ্গ শুরু করলাম। একটা আস্ত ডিম মুখে পুরে

দিয়েছি—এমন সময় অবিনাশ ঘরে ঢুকে বললে—'চা খেয়ে একটু বিশ্রাম 'কর ভাই—আমি বাজারটা করে আসি।' বিষম খেতে খেতে তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিয়ে ধাক্কা সামলে নিয়ে দেখি, অবিনাশ ততক্ষণে রাস্তায় নেমে বাজারের পথ ধ'রেছে। অবাক্ হ'য়ে ভাবলাম এসব কী ব্যাপার! অবিনাশ, যার পয়সা খাবার লোক নেই, সে একটা চাকর রাখেনি—নিজে চলেছে বাজার করতে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে একমাত্র অবিনাশ। কিন্তু কিসের জন্য এসব হেঁয়ালি!

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বারান্দায় হাত ধুতে গিয়ে দেখি—নিভা রকে বসে একখানা টোষ্ট খেতে খেতে আমায় দেখতে পেয়ে চকিতে ম্লান মুখে অপরাধীর মত রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো। বুঝলাম আমার সঙ্গে দেখা করা বা কথাবার্তা ক'ওয়া, ওর নিষেধ। কিন্তু কেন?

ঘরে ঢুকে দেখি ইতিমধ্যে, যাদুমন্ত্রে কে যেন ট্রেটি নিয়ে গেছে, আর সেইখানে রেখে গেছে ছোট্ট একটা রেকাবিতে দুটো পান—আর মসলা। পান খাই না, দুটি মসলা মুখে দিয়ে ভাবলাম—যা থাকে কপালে, অবিনাশ বাজার থেকে ফিরলেই আগে এর হেস্তনেস্ত করে তবে অন্য কথা।

রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি—শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম মনে নেই।

৩

ভাত খাবার জন্য গায়ে ধাক্কা দিয়ে অবিনাশ ডাকছিল, ধড়মড় করে উঠে দেখি বেলা একটা বেজে গেছে। অবিনাশ হেসে

বললে, 'ট্রেনে মোটেই ঘুম হয়নি, না ?' বললাম—'একদম না। ট্রেনে আমার কোনও দিনই ঘুম হয় না, ঐ দোলন আর কানের কাছে একঘেয়ে ঝক্ ঝক্ ঝক্—ঘুম দেশ ছেড়ে পালায়।'

মাঝের ঘরটিতে খাবার দেওয়া হয়েছিল,—তুখানা আসন পাতা, তার সামনে তুথালা ভাত, তার চার পাশে পাঁচ-ছ'টি বাটিতে আঁশ-নিরামিষ তরকারি। পাশাপাশি আমি আর অবিনাশ খেতে বসলাম—চারদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু নিভা দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি সরে যাচ্ছিল, কি জানি কেন কথা কইতে ইচ্ছে হ'ল না আমার,—খিদে পেয়েছিল, মুখ গুঁজে বাটির পর বাটি শেষ করে চললাম। এরই মধ্যে তুটো প্লেটে করে দই মিষ্টি রেখে গেলেন, অবিনাশের স্ত্রী নয়, সেই প্রৌঢ়া মেয়েটি। সত্যি কথা বলতে কি—অবিনাশের স্ত্রীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল! খেয়ে দেয়ে বাইরে আমার ঘরে এসে মসলা খেয়ে সিগারেট ধরালাম। কিছু বলবার আগেই অবিনাশ বললে—'বেশ করে একটা ঘুম দাও, রাতে ত' চোখের পাতা বোজোনি।' সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে ওকে বলি—এইবার একটা মজবুত তালা এনে চাবি লাগিয়ে দাও,—যাতে পালাতে না পারি। কিছু না বলে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘরে একখানা বই—বা খবরের কাগজও নেই যে তা দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে দেবো। সকালে ট্রেন থেকে নামবার পর এদের অদ্ভুত আচরণগুলো একটার পর একটা মনে মনে সাজিয়ে একটা সহজ মীমাংসায় পৌঁছুবার চেষ্টা করলাম—পারলাম না। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ

অবিনাশের চাপা গলার আওয়াজ কানে এল—'একবারটি এস লক্ষ্মীটি !'

উত্তরে লক্ষ্মীটি যে কি বললে শুনতে না পেলেও অবিনাশের পরের কথাগুলো শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।—'লজ্জা ? এত লজ্জা কিসের ? এত করে বলছি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তা সকাল থেকে তার সামনে পর্যন্ত গেলে না—ও কি মনে করছে বলতো ? এস।'

ইচ্ছে করে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। কানে এল—কি ব্যাপার, সন্ধ্যে হয়ে গেছে এখনও ঘুম ভাঙ্গলো না ?

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার ভান করে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। একটা কিছু সাফাই বলতে গিয়ে বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হতবাক হয়ে গেলাম। অবিনাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিনতি—মীনা !!

চমক ভাঙ্গলো অবিনাশের কথায়—এই আমার স্ত্রী মমতা—একটু বেশী সেকেলে পন্থী, আর লজ্জাটা একটু বেশী।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হ'ল মীনার সঙ্গে, দু'চোখে রাজ্যের মিনতি জড় করে কী সে বলতে চায় বুঝতে কষ্ট হল না। সামলে নিয়ে সহজভাবে বললাম—'বেশ যা হোক বৌদি ! অতি কষ্টে ছুটী নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ছুটে এলাম এত দূরে —আর আপনি কিনা লজ্জাটাকেই আঁকড়ে আড়ালে সরে রইলেন ? লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ স্বীকার করি—কিন্তু বেশীটা সন্দেহ জাগায়।'

অবিনাশ বললে,—'যা বলেছ ভাই। তোমার সামনে তবু এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোনও আলাপী লোকের সামনে ওকে নিতে পারিনি।'

সহজ কথাবার্তায় ঘরের আবহাওয়া খানিকটা বদলে গেল।

অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললাম,—'তাই তো কি যে করি, গরীবের ঘরে বৌদির পায়ের ধুলো পড়লো—অথচ উপযুক্ত এমন একটা আসন নেই, যাতে ওঁকে বসতে বলে সম্বর্ধনা জানাই।'

তিনজনেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। মীনা অবিনাশকে বললে,—'তোমরা দুই বন্ধুতে গল্প কর, আমি রান্নাঘরে চল্লুম—নইলে খেতে রাত বারোটা-একটা বাজবে।' মীনা চলে গেল। ইচ্ছে করেই বাধা দিলাম না। সংসার-অনভিজ্ঞ সরল লোকটার সামনে আর বেশীক্ষণ অভিনয় করতে মন চাইল না। বিছানায় আমার পাশে বসে অবিনাশ বললে,—'কেমন দেখলে বল?' বললাম,—'চমৎকার! সত্যিই তোমার স্ত্রী-ভাগ্যে হিংসা হয় অবিনাশ।' বেশ বুঝতে পারলাম, লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে অবিনাশ। বললাম—'তা এতদিন বাদে চিরকুমার ব্রত ভাঙবার কারণটা কি ঘটলো হঠাৎ?' একটু চুপ করে থেকে বললে অবিনাশ—'সে অনেক কথা ভাই, কোন্‌টা আগে শুরু কোরবো ভাবছি।'

বললাম—'তোমায় ভাবনার হাত থেকে রেহাই দিচ্ছি আমি। সকাল থেকে এক ঝুড়ি প্রশ্ন মনের মধ্যে জমে আছে, এক-একটা বার করি—তুমি জবাব দিয়ে যাও।'

প্রথম প্রশ্ন,—'বিয়ে করে তুমি এত বড় কঞ্জুস হয়ে উঠলে কবে থেকে—যার জন্য বিদেশে এ-রকম ছোট্ট একটা বাড়ী নিয়েছো, একটা চাকর পর্যন্ত রাখনি, শুধু একজন রাঁধুনী—' হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে বাধা দিল অবিনাশ, বললে,—'উনি মমতার মা!'

ভারি লজ্জা পেলাম, কিন্তু কৌতূহল তখনও রয়েছে, বললাম—'মাফ করো ভাই, না জেনে বলেছি—কিন্তু অন্য প্রশ্ন দুটো?'

অবিনাশ বললে—'চাকর মমতা রাখতে দেয়নি, আর এর বেশী টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।' শেষের

দিকটা গলা ধরে এল অবিনাশের। একেবারে বেকুব বনে গেলাম! তবুও জোর করে বললাম—'এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে বল অবিনাশ? তোমাদের অবস্থা যদি আমি না জানতাম তা'হলে হয়ত বিশ্বাস করতাম।'

ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে তোশকের একটা ধার নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিল অবিনাশ—'বাড়ীর সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছেন।'

কথা খুঁজে পাইনে। অন্ধকার ঘরে দুজনে প্রেতের মত চুপ করে বসে থাকি। আমিই কথা বলি—'মমতাকে বিয়ে করার জন্যই কি?'

'হ্যাঁ! কিছুদিন আগে এক রায়বাহাদুরের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবা আমার বিয়ের ঠিক করেন—তখন আপত্তি করে বলেছিলাম—বিয়ে মোটেই কোরবো না। তারপর কিছুদিন বাদে একে বিয়ে কোরবো বলতেই বাবা রাগে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন,—জানো তো কি রকম রাশভারী একগুঁয়ে লোক। আমায় পরিষ্কার বলে দিলেন—এত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করলুম, অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ টাকা যৌতুকই পেতে, তা না করে কোথাকার বস্তির একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? এসব পাগলামি আমার বাড়ীতে চলবে না।' অবিনাশ চুপ করলো। জিজ্ঞাসা করলাম—'তার পর'?

—'বাবাকে বললাম—বিয়ে না করলেও আমার চলবে না বাবা, কথা দিয়েছি'। একটু ভেবে বাবা বললেন,—'বেশ, আমার কথার চেয়ে যদি তোমার কথার দাম বেশী মনে কর, তা'হলে এ বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে বাইরে গিয়ে কথা রাখো।' শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন বাবা, স্বরে উষ্ণতা ছিল না—

বুঝলাম, এর আর নড়চড় হবে না। সেই দিনই চলে এলাম, আর—'।

বাধা দিয়ে বললাম,—'থাক থাক, আর বলতে হবে না, দোষ আমারই। অনেক দিন তোমার খোঁজ-খবর রাখিনি বলেই এত গুলো প্রশ্ন করেছি।' আর কি বলে সান্ত্বনা দেব, কথা খুঁজে পাই না, চুপ করে থাকি, অবিনাশও চুপ, অন্ধকার ঘরে কেমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া বরফের মত জমে নিথর হয়ে থাকে। অবিনাশের নাটকীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথাই ভাবছিলাম। বাইরের কেউ, যারা ওকে জানে না, তারা ত বিশ্বাসই করবে না কথাগুলো, আর সত্যি বিশ্বাস করবার কথাও নয়। কিন্তু আমি তো জানি অবিনাশকে—আমি জানি ওর প্রতিটি কথা সত্যি,—এক কথায় কুবেরের ঐশ্বর্য ঠেলে ফেলে বস্তির দারিদ্র্য মাথা পেতে নিতে পারে, এক গল্প-উপন্যাসের নায়ক, আর পারে মঞ্চের বা পর্দার হিরো—এই ত জানতাম এতদিন ; আজ অবিনাশের নামটাও যোগ করে দিলাম ওর সঙ্গে। মীনার সঙ্গে ওর পরিচয় আর বিয়ের ইতিহাসটা জানবার অদম্য কৌতূহল মনটাকে তোলপাড় করে তুলছিল—কিন্তু এই থম-থমে অস্বস্তিকর পরিবেশে সেটা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম—ঠিক এমনি সময় একটা হ্যারিকেন হাতে ঘরে ঢুকলো নিভা। আলোটা মেজের ওপর রেখে অবিনাশকে বললে—'দাদাবাবু, দিদি ডাকছে, শিগ্‌গির একবার আসুন।' অবিনাশ ও আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঐ ছোট্ট হ্যারিকেনের আলো আমাদের মনের আঁধার দূর না করলেও ছোট্ট ঘরের অন্ধকার অনেকখানি ঠেলে ফেলে দিল। অবিনাশ উঠে ভেতরে গেল। আমি হ্যারিকেনটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

৪

রাত্রে খাওয়ার সময় মীনাই পরিবেশন করলে—কিন্তু সহজ ভাবে কথাবার্তা কেউ কইতে পারলাম না, না অবিনাশ না আমি। কোনও মতে ফরম্যালিটি বজায় রেখে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে চলে এলাম। নিঃশব্দে একটা সিগারেট শেষ করে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি—ভেতরের দিকের দরজাটায় খিল নেই—অগত্যা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ অবিনাশের কথাটা মনে পড়ল—'শুকনো পাহাড়ের দেশ, সাপ-খোপের ভয় আছে, রাত্রে আলো না নিয়ে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।' অন্ধকারে হাতড়ে স্যুটকেশ থেকে টর্চটা বার করে মাথার বালিশের পাশে রেখে দিলাম।

চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে আছি, যদিও নির্ঘাত জানি ঘুম আজ আর আমার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষবে না। ভাবছিলাম শুধু মীনা আর অবিনাশের এই অদ্ভুত যোগাযোগের কথা, কি করে পরিচয় হল, ঐ লাজুক ছেলেটির আজন্ম লজ্জার আবরণ কোন্ যাদুমন্ত্রে সরিয়ে নিল মীনা?—

বায়োস্কোপের ফ্লাসব্যাক ছবির মত প্রথমটা আবছা, পরে স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার বন্ধ চোখের সামনে—ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। বছর দেড়েক আগের কথা। 'শকুন্তলা' ছবির স্যুটিং; রাজা দুষ্মন্ত সেজে বসে আছি অসংখ্য পাত্র, মিত্র, সৈন্য, সভাসদ নিয়ে—রাজসভার বহুমূল্য সিংহাসনে। পরিচালক অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাসিস্ট্যান্টদের ওপর—'এখনও একস্ট্রা মেয়েদের মেক-আপ শেষ হল না? কখন তাহলে স্যুটিং হবে? বেলা দুটো বেজে গেছে।' দু-তিনজন ব্যস্ত হয়ে ছুটলো মেক-আপ রুমের

দিকে। মিনিট দশেক বাদে আট-দশটি মেয়ে ঢুকলো সেটে। মারাঠি ধরনে কাছা-কোঁচা দিয়ে রঙীন কাপড় পরা, অনাবৃত দেহ, শুধু বুকটা এক ফালি রঙীন কাপড় দিয়ে কষে বেঁধে পেছনে গেরো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া, হাতে, গলায়, তখনকার দিনের অনু-করণে জড়োয়া গহনা—মাথায় ফুলিয়ে বাঁধা খোঁপায় রঙ-বেরঙের জরি জড়ানো। যেনো বিভিন্ন রঙের কতকগুলো প্রজাপতি ফুল-বাগানে না ঢুকে এসে পড়েছে পথ ভুলে রাজসভায়। সাধারণতঃ একস্ট্রা মেয়েদের চেহারা যেমন হয়—মোটামুটি চলনসই, সাজলে-গুজলে মন্দ দেখায় না।

একটি মেয়ে শুধু ওরই মধ্যে যেন বেশ একটু ব্যতিক্রম। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে কাত হয়ে বসেছিলাম—সোজা হয়ে উঠে বসলাম। সব ছেড়ে চোখ দুটো শুধু ঐ একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে অপলক চেয়ে থাকতে চায়। সব দিক দিয়ে এমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে কদাচিৎ নজরে পড়ে। বড় টানা-টানা চোখ, নিটোল নিখুঁত মুখখানাতে নিষ্পাপ প্রথম যৌবনের সরম-জড়ানো স্নিগ্ধতা। একে যেন প্রশংসা করেও অতৃপ্তি থেকে যায়, মনে হয় যেন সব বলা হল না। দেখলাম সেট-সুদ্ধ লোক ওকে দেখে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্য মেয়েরা ইতিমধ্যে পরিচিত, অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে,—ঐ মেয়েটি শুধু নতমুখে জড়সড় হয়ে এক পাশে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। পরি-চালক মেয়েদের সিংহাসনের চারপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন—কারও হাতে ফুলের থালা—কারও হাতে চামর, ধূপ, তাম্বুলাধার, সব শেষে ঐ মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঠিক সিংহাসনের পেছনে—আমার মাথার কাছে—হাতে দিলেন একখানা বড় তালপাতার পাখা, তাতে নানা কারুকার্য করা, ঝালর দেওয়া—আর

বলে দিলেন সট আরম্ভ হলে আস্তে আস্তে ঐ পাখা দিয়ে রাজাকে অর্থাৎ আমাকে হাওয়া করতে।

দু-তিনটে সট নেওয়া হয়ে গেল—অন্য মেয়েরা হাতের থালা নামিয়ে ইতস্ততঃ বসে গল্প-গুজব করতে শুরু করে দিল—পেছন ফিরে দেখি ও ঠায় নতমুখে পাখা নেড়ে হাওয়া করেই চলেছে। বললাম—'থাক থাক, যখন ছবি নেওয়া হবে, তখন শুধু হাওয়া করবে,—অন্য সময় নয়'। পাখা থামিয়ে নতমুখে ও দাঁড়িয়ে থাকে। বলি—'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? বোসো'ঃ বসে না, কোনও জবাবও দেয় না। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করি—মন চায় ওকে পাশে বসিয়ে আলাপ করি—চক্ষুলজ্জা আর সেটের সবার ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়ে সাহস পাই না। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যায়—অন্য সটের জন্য লাইট সিফ্‌ট্ করা হচ্ছে—সট নিতে অন্ততঃ এক ঘণ্টা দেরী হবে—হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওর হাত ধরে বলি—'বোসো এখানে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?' জড়সড় হয়ে বসে পড়ে সিংহাসনের এক পাশে। বেশ বুঝতে পারি অন্য মেয়েরা এবং সেটের বহুলোক আমাদের কথা নিয়ে হাসাহাসি করছে—গ্রাহ্য করি না, জিজ্ঞাসা করি,—'তোমার নাম কি?' নতমুখে ও জবাব দেয়—'মিনতি!'

'কোথায় থাকো?' মিনতি জবাব দেয়—'বেলেঘাটায়'। আর কথা খুঁজে পাই না—অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকি। চমক ভাঙ্গে পরিচালকের কথায়—'আমরা অনেকক্ষণ রেডি হয়ে বসে আছি। মহারাজ দুষ্মন্ত হুকুম করলেই স্যুটিং আরম্ভ করতে পারি।' লজ্জা পাই, মিনতি তাড়াতাড়ি পাখা হাতে নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে শুরু করে। সুটিং শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিন এই পর্যন্ত। পাঁচ দিনের কাজ ছিল

রাজসভার সেটে। দু-তিন দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। এর মধ্যে মিনতির অনেক খবরই জানতে পেরেছি। নাম মিনতি, মীনা বলেই সবাই ডাকে। বেলেঘাটায় একটা বস্তির ভেতর একখানা ঘর, পনের টাকা ভাড়া দিয়ে থাকে। বাবা কলকাতায় এক সওদাগরী আফিসে কেরাণীর কাজ করতেন —আজ ছ' মাস হল আফিস থেকে আসবার সময় ট্রাম থেকে পড়ে যান—সঙ্গে সঙ্গে একখানা চলতি ট্যাক্সি এসে চাপা দেয় —অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—আর জ্ঞান হয় না। তারপর ছ'মাস ধরে বিধবা মায়ের সামান্য গহনা বিক্রি করে দেনা ও বাড়ীভাড়া শোধ দিয়ে কোনও মতে একবেলা খেয়ে—বস্তিতে উঠে আসে। ঐ বস্তিতেই থাকে দু' তিনটে মেয়ে—তারা সিনেমায় এক্সট্রার কাজ করে। তাদের পরামর্শে মীনা কাজ করতে এসেছে। সংসারে বিধবা মা, ছোট একটা আট ন' বছরের বোন ও ছ' বছরের একটি ভাই।

সব শুনে গুম হয়ে গেলাম। বললাম,—'হুঁ, কিন্তু এই সামান্য কাজ করে তুমি কী এমন রোজগার কোরবে—যা দিয়ে চার-পাঁচটি লোক খেয়ে-পরে বাঁচবে?' উত্তর দেয় না মীনা, ফ্যাল ফ্যাল করে মহা শূন্যে চেয়ে বুঝি বা যোগ্য উত্তর খোঁজে। বলা বাহুল্য এই ক'দিনে সমস্ত স্টুডিও মহলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছি আমি আর মীনা। মীনার কথা ঠিক বলতে না পারলেও আমার যে বেশ খানিকটা দুর্বলতা এসে গেছে ওর ওপর, একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

একদিন স্যুটিং-এর অবসরে মীনা বললে—'মাকে আমি আপনার কথা সব বলেছি', তিনি বললেন,—'ওঁর মত লোক

যদি তোমার জন্য একটু চেষ্টা করেন, তা'হলে ছবিতে ভাল চান্স পেয়ে নাম করতে তোমার দেরী হবে না।'

বললাম,—'চেষ্টা আমি নিশ্চয় কোরবো—তবে উপযুক্ত চান্স আসতে হয়তো কিছুটা দেরী হবে,—ততদিন তুমি চালাবে কি করে? তা'ছাড়া এ লাইনে প্রলোভন এত বেশী যে, শুরুতেই পা পিছলে বদনাম করে বসলে, পরে বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হবে।'

আজও স্পষ্ট মনে আছে,—প্রায় এক মিনিট নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল মীনা—তারপর বলেছিল—'যদি খুব বেশী দেরী না হয় তা'হলে উপোস করে হোক বা যেভাবেই হোক, অপেক্ষা আমি কোরবো, আর যদি পা পিছলানো ছাড়া আর কোনও গতি নেই বুঝতে পারি—তা'হলে—তার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা আমি কোরবোই—কথা দিলাম।'

রাজসভার সেটের সেদিন শেষ স্যুটিং। কেন জানি না, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেক-আপ তুলে গাড়ীর জন্য স্টুডিওর গেটের দিকে পা বাড়ালাম। মধ্যে দু'ধারে ফুলের গাছ বসানো সরু সিমেণ্টের পথ পড়ে। আলো-অন্ধকারে ঢাকা সেই পথ দিয়ে বুঝিবা মীনার কথা ভাবতে ভাবতেই চলেছি —হঠাৎ হুড়মুড় করে কে যেন পায়ের ওপর এসে পড়লো। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই দেখি আমাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে মীনা—কিছুদূরে দেখি বস্তির আর দু'টি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মীনার অপেক্ষায়।

বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই আবছা অন্ধকার পথে, কে এসে বললে,—'এ কি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? গাড়ী রেডি করে ওরা সব তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'বাড়ী চলে এলাম।'

এরপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে। মীনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই নি, খবরও পাই নি। আমার এক পরিচালক-বন্ধু নতুন ছবি তুলছেন শুনে তার সঙ্গে দেখা করে মীনার কথা বললাম। সব শুনে তিনি বললেন—'নতুন মেয়ে, একেবারে হিরোইনের পার্ট দিয়ে রিস্ক্ নেওয়া ঠিক হবে না। তবে তুমি যা বলছো, চেহারা যদি সত্যিই ভাল হয়, তা'হলে আমি একটা ছোট সাইড্ রোল, এই সাত-আট দিনের কাজ, দিয়ে দেখতে পারি। দু'-এক দিনের মধ্যেই আমাকে ফাইনাল কাস্টিং করে ফেলতে হবে। গাড়ী দিয়ে লোক পাঠালে এখুনি নিয়ে আসতে পারো ?'

একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। গাড়ী নিয়ে লোক চলে গেল মীনাকে আনতে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক হা-পিত্যেশে বসে আছি—গাড়ী বা মীনার দেখা নেই। আরও কিছু সময় কাটলো, তারপর ফিরে এল শুধু গাড়ী, মীনা আসে নি, মানে সেখানে নেই। বস্তির অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছে খোঁজ নিয়ে শুনে এসেছে, আজ দিন সাতেক হোল এক ধনী মাড়োয়ারীর সুনজরে পড়ে ওরা সবাই চলে গেছে বস্তি ছেড়ে, কোথায়, কেউ বলতে পারে না। সব শুনে পরিচালক-বন্ধু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন,—'এই হয়, এই স্বাভাবিক। তুমি যা বললে—ও-রকম সুন্দর চেহারা নিয়ে বেশী দিন কেউ বস্তিতে থাকে ? না থাকতে পারে ? ওদের স্থান অট্টালিকায়।'

সমস্ত মনটা তেতো বিষাক্ত হয়ে গেল। শুধু ভাবছিলাম—সেদিনের মীনার সেই নীরব চাহনি,—স্টুডিওর পথে আবছা আঁধারে হঠাৎ প্রণাম করে চকিতে চোখের জল লুকিয়ে ছুটে

পালিয়ে যাওয়া,—এ সবই মিথ্যে? সত্যি শুধু ছবির পর্দায় ইনিয়ে-বিনিয়ে সস্তা প্রেমের অভিনয়?

……ধড়মড় করে উঠে বসে বালিশের পাশ থেকে টর্চটা নিয়ে জ্বালতেই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমার পায়ের তলায় উপুড় হয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদছে মীনা, মানে মমতা, আমার আশৈশবের বন্ধু সরল, উদার অবিনাশের স্ত্রী।

টর্চ নিভিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এত রাত্রে এভাবে আমার ঘরে এসেছ, অবিনাশ জানে?' অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কানে ভেসে এল মীনার ছোট্ট উত্তর—'না'। বললাম,—'কাজটা ভাল করনি, যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় তোমায় না দেখতে পেয়ে এসে পড়ে অবিনাশ?'

মীনা বললে—'বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে এসেছি—তা-ছাড়া, রাতে ও'র ঘুম ভাঙ্গে না—গাঢ় ঘুম।' চুপ করে কান পেতে শুনি শেষের ঘরটা থেকে অবিনাশের চাপা নাকডাকার আওয়াজ।

বললাম,—'তোমার সঙ্কোচ, লজ্জা—এত রাত্রে এই অভিসার-এর কারণ আমি জানি মীনা—তাই প্রথমেই বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার! তোমার কোনও উপকারে আসতে পারিনি আমি সত্যি, কিন্তু তাই বলে ক্ষতিও কোরবো না কোনদিন।'

অন্ধকারে শুনতে পেলাম,—'তা আমি জানি, আপনি হয়তো অভিনয়ে ঢেকে মানিয়ে নেবেন, কিন্তু আপনার সামনে আমি যদি কোনও দিন ধরা পড়ে যাই?'

হেসে বললাম—'বুঝেছি কি বলতে চাও। বেশ তাই হবে, আজ থেকে তোমাদের এ সুখের নীড়ে বাজপাখীর মত উদয় হব না কোনও দিন, কথা দিয়ে গেলাম। আর একটা কথা—আমার

সঙ্গে তোমার আলাপ আছে এবং কোথায়, কিভাবে সে আলাপ হয়েছিল—একথা অবিনাশকে বলেছ ?'

মীনা শঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—'না—শুধু ঐটুকু ছাড়া আর সব উনি জানেন। ঐ কথাটা চেষ্টা করেও বলতে পারি নি।'

বললাম—'ভাল করনি। বনেদ পাকা না করে তার ওপর তুমি অট্টালিকা তুলে চলেছ। যদি কোনও দিন অবিনাশ জানতে পারে—আমার কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু তোমার ?'

কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে মীনা। বললাম,—'আর একটা কথা শুধু জানতে চাই—তা'হলে আমার ক্রস-ওয়ার্ড পাজল-এর সব ঘর পূর্ণ হয়ে যায়। কোথায় কি করে অবিনাশের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল ?'

অন্ধকারে বুঝতে পারলাম, তক্তাপোশের এক পাশে উঠে বসেছে মীনা, তারপর বললে,—'সেদিন কি একটা কাজে গাড়ী করে আমাদের বস্তির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি—আমার ছোট ভাই নিতু রাস্তায় খেলা করছিল—ওঁর গাড়ীর ধাক্কায় পড়ে যায়! উনি তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে খোঁজ করে বস্তিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন! প্রথমে মনে হয়েছিল কিছুই হয় নি কিন্তু পরে হাসপাতালে গিয়ে জানা গেল বুকে চোট লেগেছে—ইনটারন্যাল হেমারেজ—সেই দিন ভোর রাত্রে নিতু মারা যায়।' একটু চুপ করল মীনা। তারপর বলতে শুরু করলে—'এরপর থেকে রোজই সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ী আসতেন উনি—চুপ করে ঘণ্টা দুই বসে থাকতেন, তারপর কোনও কথা না বলে চলে যেতেন! এইভাবে এক হপ্তা কেটে যায়, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কাছে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন উনি।

এর মধ্যে লোকমুখে ওঁর পরিচয়ও কিছু কিছু জেনেছি আমরা। প্রথমটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু······।'

বাধা দিয়ে বললাম,—'থাক বলতে হবে না; আর সবই আমার জানা। এবার তুমি যেতে পারো। ভোরের আর দেরী নেই,—তা-ছাড়া সকাল ন'টার গাড়ীতে আমায় কলকাতায় ফিরতে হবে। মনে হল একটু যেন থমকে দাঁড়াল মীনা,—যেন কিছু বলবে, বললে না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

কাহিনী আমার শেষ হয়ে গেছে মীনার চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু জম-জমাটি ভাল গান শেষ হয়ে গেলেও যেমন তার সুরের মূর্চ্ছনার রেশ কিছুটা থেকে যায়, তেমনি এর একটুখানি জের টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

ভোরের দিকে বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—হঠাৎ জেগে দেখি বেশ বেলা হয়ে গেছে—পাশে চুপটি করে বসে আছে অবিনাশ।

বেশ একটু লজ্জিত হয়ে বললাম,—'বেশ লোক তো? এত বেলা হয়ে গেছে ডেকে দাওনি কেন? ন'টার গাড়ীতে যেতে হবে আমায়।' একটু যেন অবাক্ হয় অবিনাশ বলে—'আমি জানতাম দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ।'

সঙ্গে সঙ্গে বলি—'একদম ভুলে গেছলাম ভাই, অন্য একটা ছবির স্যুটিং-এর ডেট অনেক আগে দেওয়া ছিল—আজ রাত আটটায় স্যুটিং—বেলা পাঁচটার মধ্যে কলকাতায় আমার পৌঁছুতে হবেই।

আর কোনও প্রতিবাদ করে না অবিনাশ উঠে ভিতরে চলে যায়। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে, জল-টল খেয়ে মামুলি বিদায়ের

পালা শেষ করে দুই বন্ধু চলে আসি স্টেশনে। ভাগ্য খুব ভালো, সেকেণ্ড ক্লাশের একটা ছোট্ট কামরা খালি পেয়ে যাই। ট্রেনের বেশী দেরী নেই, বাইরে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে ট্রেনের কামরায় আমার দিকে চেয়ে অবিনাশ বলে—তোমার বৌদির পেছনের ইতিহাসের একটুখানি অধ্যায় হয়তো অন্ধকারে ঢাকা আছে—কিন্তু তার জন্যে আমার তো কোনও কৌতূহল বা ক্ষোভ কিছু নেই—আমিতো ওকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি।—তবুও ও কেন সব সময় একটা সঙ্কোচ ও লজ্জার পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায়, বলতে পার? আমি ভাই মেয়েদের ব্যাপার কিছুই বুঝি না—তোমরা সংসারে অনেক দেখেছ, অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছ—অনুমান করতে পার কিসের সঙ্কোচ, কিসের লজ্জা, কিসের এত আশঙ্কা ওর?

কী উত্তর দেব? ওর মুখের দিকে চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল—হয়তো মীনার সাধের অট্টালিকা এখুনি ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এ বিপদে রক্ষা করলেন ভগবান—ঘণ্টা দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। জোর করে মুখে হাসি এনে ওর হাত দুটো মুঠো করে ধরে বললাম—'কোনও ভয় নেই অবিনাশ, দুদিন বাদেই দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে ট্রেন ছুটতে থাকে। একলা কামরার বাইরে চেয়ে উদাসভাবে বসে থাকি। জেসিডির গাছ-পালা, ছোট পাহাড় সব যেন আজ ভয়ে আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে শুধু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে টেলিগ্রাফের তারগুলো, থামগুলো সঙ্গ ছাড়ছে না। একটু বাদে মনে হল—ওগুলো টেলিগ্রাফের তার নয়—অবিনাশ আর আমার মধ্যে যে যোগসূত্র এতদিন অলক্ষ্যে আত্মগোপন করেছিল, আজ সেটা প্রকট হয়ে চোখের সামনে ভেসে

উঠেছে—প্রাণপণে চেষ্টা করছে যোগসূত্র বজায় রাখবার,—কিন্তু পারল না—জেসিডির সীমানা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ পট্ করে ছিঁড়ে গেল। আর কিছুই দেখতে পাই না। জলে চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম।

বন্ধনমুক্ত ট্রেন তখন ফুল স্পীডে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে।

জলের ডাক

তিন তিনটে ছেলে হইয়া মরার পরও নিবারণের যখন আবার সেই ছেলেই হইল, তখন পাড়া-প্রতিবেশীরা তাহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেও নিবারণ কিন্তু প্রাণ খুলিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিতেছিল না। কেমন মন-মরা হইয়া সে দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া উদাস দৃষ্টিতে দূরের মরা নদীটার দিকে চাহিয়া রহিল।

ডাবা হুঁকায় কসিয়া একটা টান মারিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জগন্নাথ পাড়োই বলিল—'তা তুমি যতই কও খুড়ো, আজগের দিনে এরকম করে বসে থাকৃতি তুমি কিচুতি পার্বা না।'

ও পাড়ার নিতাই একপাশে বসিয়া জাল বুনিতেছিল। ক্ষণেকের জন্য বোনা ক্ষান্ত দিয়া সে কহিল—'আমুউ ত তাই কচ্ছি, সে গুলো মরেছে বলে এডাও যে বাঁচবে না তাই বা কেডা কতি পারে। তা জগ ভাইপো! কল্‌কেডা একবার এদিক্ দিয়ো, একা একাই খাবা ?'

নিবারণ সব বুঝিতেছিল,—কিন্তু চোখের উপর সেই যে তিন তিনটা সোনার চাঁদ ছেলে মরিয়া গেল—তাহার ভীষণ স্মৃতিটা যে এখনও তাহার চোখের সুমুখে ভাসিতেছে। নিজের অজ্ঞাতে তাহার চোখ দুটি বেদনায় ভারী ও ঝাপসা হইয়া উঠিল।

এই ত সেদিন,—এখনও নিবারণের বেশ মনে আছে, আঁতুড় ঘরে সাত দিনের দিন প্রথম ছেলেটা মারা গেল। হায় রে! সেই

এক ফোঁটা ক্ষুদ্র শিশুকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে মনে মনে কতই না সুখের কল্পনা করিয়াছিল। তারপর দু বৎসর পরে আবার একটা। সে বাঁচিয়াছিল মাত্র এক বৎসর। আহা কি সুখেই না তাহারা সেই বৎসরটা কাটাইয়াছিল। সে শোকও তাহারা ভুলিতে পারিয়াছিল—ছোট ছেলেটার মুখ দেখিয়া। দীর্ঘ সাতটা বছর কাটাইয়াও যখন সে বাঁচিয়া রহিল, তখন তাহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর দেবতা তাহাদের সে সুখটুকুও নির্বিবাদে ভোগ করিতে দিলেন না ত?

নিবারণ কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না যে তাহার উন্নত বলিষ্ঠ বুকখানাতে তিনটে প্রচণ্ড শেলের ঘা মারিতেই শুধু তাহাদের জন্ম।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ বলিল,—'সবই'ত বোঝলাম রে ভাই, কিন্তু যদি বাঁচবারই হবে তা'লি সব কডাই বা ম'ল কেন? ছেলে আমার কপালে নেই। বুকির যে পাঁজরা কখান্ বাকি আছে এ আপদ্‌টা তাই ভাঙি দিতি আয়েছে। দূর কর, তুমুউ যেমন!'

জগন্নাথ কি একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। নিবারণ আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল,—ভাবেলাম তো! বুড়ো বয়সে ছেলে তিনডে থাক্‌লি আর আমার দুঃখু কিসির! পোড়া কপাল আমার! আবার এই শেষ বয়সে ইনি জ্বালাতি আলেন্, মরে যাক আপদ্।

কিন্তু এই মরে যাক্ কথাটা বলিবার সময় তাহার বুকখানা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল! অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিবারণ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

'—কৈ রে নিবারণ আছিস্ নাকি?'

নিমেষে আপনাকে সামলাইয়া কাপড় দিয়া চোখ তুইটা মুছিয়া নিবারণ উঠানে নামিয়া বলিল,—'আজ আমার কি সৌভাগ্যি! দেবতার পা'র ধুলো আমার ভিটেয় পড়ল।' গড় হইয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের পায়ের ধুলো প্রথমে মাথায়, পরে বুকে, তার পরে মুখে দিয়া নিবারণ বলিল,—তা দয়া করে যখন এ গরীবির বাড়ী আয়েছেন তখন বস্‌তি আজ্ঞে হোক্। 'ওরে ও নেতা—দে না বাপ পিঁড়িখান পাতে, ঐ ঘরের মচ্চি আছে।'

গোবিন্দ তর্করত্ন দাওয়ায় উঠিয়া পিঁড়িখানায় বিপুল দেহভার ন্যস্ত করিয়া বলিলেন,—'ওরে জগা একটু তামাকও অন্ততঃ খাওয়া।' সসম্ভ্রমে জিভ কাটিয়া জগন্নাথ তামাক সাজিতে বসিল।

তর্করত্ন কহিলেন,—'হ্যাঁ, তারপর ভালকথা, নিবারণ তোর্ নাকি আবার একটা ছেলে হয়েছে?'

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া নিরুত্তরে নিবারণ শুধু ঘাড় নাড়িল। সেদিকে না চাহিয়াই তর্করত্ন বলিতে লাগিলেন,—'সেই কালেই বলেছিলাম, নিবারণ একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-টন কর্। শুনলিনে, ফলও তার হাতে হাতে টের পেয়েছিস্। —দেবতা বামুনে ভক্তি-টক্তি ত তোদের আর নেই!'

পুনরায় গড় হইয়া প্রণাম করিয়া নিবারণ বলিল,—'সেও কি একটা কথা হ'ল ঠাউর মশাই? তবে কি জানেন? সে সময়ডা আমার বড্ড খারাপ যাচ্ছিল, খাল বিল নদী সব শুক্‌নো, কোন ঠাঁই একটা ক্ষুদে চিঙড়েও পাবার যো ছিল না। ন'লি দেবতার আদেশ ঠেলবার সাহস নিবারণের?'

মনে মনে খুশি হইয়া তর্করত্ন বলিলেন,—'তা যা হবার হয়েছে—তা ভেবে আর মিছে তুঃখ করিস নে। এখন ভাল করে একটা স্বস্ত্যয়ন করিয়ে নে; দেখ যদি এটাও বাঁচে! কাল সকালে আমার

ওখানে যাস্, ফর্দটা দেবো।' নিবারণকে নিরুত্তরে তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তর্করত্ন পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—'পাপ, শুধু পাপের ফল নিবারণ, আর জন্মে কত পাপই না করে এসেছিস্!'

—এই এট্টা কথার মত কথা কয়েছেন ঠাউর মশায়। পাপ না থাকলি, কোনদিন নিবারণ পাড়োই কারুর এক কড়ারও ক্ষতি করে নি। কি জন্যি তার তিনডে তিনডে ছেলে দেখতি দেখতি মরে গেল? বলিতে বলিতে নিবারণ ছেড়া ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়া বার বার চক্ষু মুছিতে লাগিল।

তা দীর্ঘ দশ বৎসরেও যখন সে আপদটা মরিল না, বরং বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখনও কিন্তু নিবারণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে তাহার ভাঙা বুকখানা জোড়া দিতে সে বাঁচিয়া রহিবে। হয়তো এ আরও কিছুদিন বাদে বেশ ভাল করিয়াই তাহার বুকে শেষ ঘা' দিয়া যাইবে। এমনি সব নানা বিদ্‌ঘুটে চিন্তাই তাহার জপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নিবারণ নিজে বাছিয়া ছেলের নাম রাখিয়াছে রতন। বয়স তাহার দশ হইলে কি হয়—তাহাকে দেখাইত ঠিক চোদ্দ পনেরো বছরের কিশোর বালকের মতই। ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মাথার উপর একরাশ কাল কোঁকড়া চুলের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। অত বড় চুল রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবারণ বলিল—দেবতার মানসা। কবচ আর মাতুলীর ভারে তাহার হাত ও গলা পুরিয়া গিয়াছে। তাহাতেও কিন্তু নিস্তার নাই। যখনই নিবারণ শুনিয়াছে —অমুক স্থানের দেবতা খুব জাগ্রত,—তখনই কাহারও পরামর্শের

অপেক্ষা না রাখিয়াই সে সেখান হইতে মাদুলী আনাইয়া পুত্রের গলার ভার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে নিবারণ বলিত, '—কি জান দাদা! আমার পোড়া কপালে তো আর বাঁচবে না! দেব্‌তারা যদি কির্‌পা করে পায়ে রাখেন।'

গ্রামের লোকে বলিত, 'ছেলের মত ছেলে হয়েছে নিবারণ জেলের। আহা যেন রাজপুত্তুর।' শুনিয়া আনন্দে গর্বে নিবারণের বুকখানা ভরিয়া যাইত।

পাড়ার লোকে বলে,—'নিবারণ, ছেলেডারে অন্ততঃ জালডা ফেল্‌তিও শিকোয়ে দিয়ে যা! এর পরে খাবে কি করে?' নিবারণ মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়,—'তোরা আশীর্বাদ কর, আমার রত্না সুস্থ হয়ে বাঁচে থাক। যদ্দিন আমি বেঁচে আছি—ওরে ওসব ছুঁতি দেবো না।' শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। এমনি করিয়া নিবারণ বার্ধক্যের আশা ভরসা রতনকে সর্বদা বুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে চাহিত।

সারাদিন মাছ ধরিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ উঠানে আসিয়া ডাকিল,—বৌ!

ক্ষান্তমণি ঘরের মধ্যে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল; বলিল—এট্টু দাঁড়াও আলোডা ধরি। যে অন্ধকার! একটু পরে আলো ধরিলে দাওয়ায় উঠিয়া কাঁধ হইতে জাল নামাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কৈ! রত্নারে দেখতিছি নে যে? কনে গেল সে?

—যাবে আবার কনে? তোমার ভাব দেখলি গা জ্বলে যায়। আলে বাপু সারাদিন নদী নালা ঘাঁটো, এট্টু না হয় জিরোও না!

বাধা দিয়া নিবারণ বলিল,—তুই থাম মাগী! রত্না! ও রত্না!

রতন পাশের বাড়ীতে জগন্নাথের ছেলে ভাটাকে অঙ্ক বুঝাইতে-

ছিল। নিবারণ অল্প কিছুদিন পূর্বে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। রত্না আঁক কষিতে কষিতে সাড়া দিল,—এই যাই। একটু পরে ছুটিয়াই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিবারণ রাগ করিয়া বলিল,—'দেখদিনি তোর আক্কেলডা একবার! আচ্ছা এই ঘুটঘুটে আঁধারে তুই ও রকম করে আলি কি বলে?'

তাচ্ছিল্যভরে সে কহিল,—'ফুঃ! এ নাহি আবার আঁধার!' তাহার চোখ তখন নিবারণের সদ্য আনীত জালের মধ্যে একটা বৃহদাকার বোয়াল মাছের উপর।—'বাবা! মাছ না তো, যেন এট্টা কুমোর!' নিমেষে নিবারণের ক্রোধ গাম্ভীর্য সব কোথায় উড়িয়া গেল। সারাদিনের প্রাণপাত সেই যে পরিশ্রম, সব তাহার সার্থক বলিয়া মনে হইল। দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস দেওয়া হুঁকার মাথা হইতে কল্‌কেটি লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে নিবারণ বলিল,—'বৌ, মাচটা ভাল করে রাঁধিস্ আর মুড়োডা রত্নারে দিস্। শুনিছি ও মাছের মুড়ো খালি মগজ ভাল থাকে।'

রত্না আব্দার ধরিয়া বসিল,—'কালকে তোর সঙ্গে আমি জালে যাবো, ঠাউদ্দা ভাটারে রোজ নিয়ে যায়!······

সভয়ে জিভ কাটিয়া নিবারণ বলিল,—'ষাট ষাট, অমোন কথা কোস্ নি। গাঙে ঝড় তুফোন, কখন কি হয় বলা যায় না তো, তোরে নিয়ে যাবো আমি? পাগল?' পরে একটু ভাবিয়া কহিল, —'আর গাঙে বড় বড় কুমোর সব ভরা।'

বাধা দিয়া আব্দারের সুরে রত্না বলিল,—'উঁ! কুমোর তো তুই যাস্ কেম্‌নে, ভাটা যায় কেনো?'

ইহার সদুত্তর নিবারণ খুঁজিয়া পাইল না। একটু পরে কহিল, —'আরে, আমরা সব জানি শুনি, তাই বলে তুই? দূর!'

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রতন মারপিঠ বাধাইয়াছে। খবর পাইয়া নিবারণ কোন কথা না শুনিয়াই বিপক্ষের গালে কষিয়া এক চড় মারিয়া বসিল। ফলে তাহার পিসি মাসি যে যেখানে ছিল আসিয়া নিবারণের বাড়ী পড়িল—হতভাগা ডেক্‌রা, মত্তি চল্লো, তউ ছেলেমান্‌সি গেলো না। হচ্ছে বাপু ছেলেপিলেয় মারামারি, তুই তার মধ্যি যায়ে পড়িস্‌ কি জন্যি শুনি?

বেয়াকুবের মত হাসিয়া নিবারণ উত্তর দিল,—কি জানো পিসি! ওডা হলো—এই তোমার কি বলে—শাসন।

ঝঙ্কার দিয়া পিসি বলিয়া উঠিল,—'মর্‌ মুখপোড়া, শাসন তা নিজির ছেলেডারে কল্লিনে কেনো?

এবার যে কি বলিবে নিবারণ ভাবিয়া পাইল না। পিসি আরও বেশ দু কথা শুনাইয়া দিয়া গেল।

এই রকম নানা খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়া নিবারণ পুত্রের পরমায়ু আরও পাঁচ বৎসর বাড়িয়া গেল। সে যেন পিচ্ছিল পথে পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে পথ চলা।

৩

সারাদিন গুমোটের পর সেদিন বিকালের দিকে ঝড়-বৃষ্টি সব যেন একসঙ্গে পাল্লা দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরের কিছুই দেখা যায় না, শুধু একরাশ ধোঁয়াটে আঁধার। আর তারি সঙ্গে বাতাসের সো সো শব্দ, নদীর উন্মত্ত হুঙ্কার, দেখিতে দেখিতে কিছু-দূরে নারিকেল গাছটি মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, পূর্বদিকের গোয়াল ঘরখানি ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেল। সে যেন এক মহা-প্রলয়ের পূর্বাভাস।......

ক্ষান্তমণি সেই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে অস্থিরভাবে একবার ঘর একবার বাহির করিতেছিল। সকালে 'দিব্যে' নদীতে মাছ ধরিতে নিবারণ সেই যে গিয়াছে এখনও ফিরিল না! যাইবার পূর্বে ক্ষান্তমণি বার দুই বারণ করিয়াছিল,—আজকের মেঘলা দিন নেই বা গেলে? উত্তরে নিবারণ বলিয়াছিল,—'কথা শোন, আজকেই তো মাছ ধরার দিন রে।'

একটু পরে মাতালের মত টলিতে টলিতে জগন্নাথ জাল ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষান্তমণি নিবারণের খবর জিজ্ঞাসা করিলে সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া গেল যে সে জানে না। একটা অজানা আশঙ্কায় ক্ষান্ত'র বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে পশ্চিমের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া রতন দূরের পাগলা নদীটির মাতামাতি একমনে দেখিতেছিল।—উঃ কদ্দিন নদীতে একলা হাঁটে পার হয়ে গেলাম, আর আজগে আমার তিন তাল্ জল। উস্ কি ঢেউ, যেনো সমুদ্দুর। এই রকম সব আবোল তাবোল কত কি সে ভাবিতেছিল।

ক্ষান্ত ডাকিল—রত্না।

মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, কেনো রে মা?

'—কেনো রে মা?' হতভাগা নচ্ছার। আচ্ছা বুড়ো বেটা এই ঝড় তুফোনে বাইরি পড়ে র'ল, তোর কি এট্টু ভাবনাও লাগে না? ষোল বছরের ধাড়ি ছেলে তুই ঘরের কোণায় বসে রলি—আর সে…! ক্ষান্তমণি আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না—হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রতন অবাক্ হইয়া মার মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। এই অযথা গালাগালি আর কান্না এই দুইটার হেতু যে কি তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।—'বাঃ আমার বড্ড দোষ না? কদ্দিন কইছি, আমারে সঙ্গে নেও, তাতো নেবে না।'

তাহার ধারণা, বুঝি সে সঙ্গে থাকিলেই সব বিপদ নিমেষে কাটিয়া যাইত।

রতন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল—ঝড় ক্রমেই বাড়িতেছে। আকাশে বাতাসে জলে একাকার। উন্মত্ত নদী হুঙ্কার ছাড়িয়া তাহাদের ঘরের সমান উঁচু ঢেউয়ের সঙ্গে তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছে। আবার এ সব ছাপাইয়া কড় কড় করিয়া বাজ পড়িতেছে। এমনি অবস্থা। রতন ডাকিল, 'মা, মারে!'

ক্ষান্তমণি ভারি গলায় বলিল, 'কেনো।' তখনও সে কাঁদিতেছে। '—আচ্ছা তুই ক'লি জগা খুড়ো ফিরে আয়েছে, না! তা'র নৌকোখান তালি তো ঘাটেই আছে।'

এই সব যত বাজে প্রশ্নের উত্তর দিবার মত মনের অবস্থা তখন ক্ষান্তমণির ছিল না। কোন কথা না বলিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাওয়ার একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়া দূরের ঝাপসা আঁধারের দিকে চাহিয়া রহিল।

রতন আড় হইতে লাল গামছাখানা লইয়া কোমরে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিল। তাহার পর এক লাফে উঠানে নামিয়া বলিল—'চল্লাম মা, বাবারে নিয়ে আসছি। তুই হক্ কতাই কইছিস্। আজগের দিনি বুড়ো ছেলে ঘরের মধ্যি চুপ মারে বসে থাকা···।'

······ঐ না কেডা রত্না বলে ডাক্‌লে? সে ক্ষণেক কান খাড়া করিয়া রহিল! কোথায় ডাক্? শুধু জল বাতাস আর বজ্রের শব্দ মিলিয়া একটা প্রাণ-কাঁপানো হুঙ্কার। মাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই রতন ছুটিয়া নদীর দিকে চলিয়া গেল।

কে যেন একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি ক্ষান্তমণির বুকের মাঝখানে বসাইয়া দিল কিন্তু তখন আর উপায় নাই। সে ততক্ষণ ডাকের বাহির হইয়া গিয়াছে। ক্ষান্তমণি পাগলিনীর মত ছুটিল,—'ওরে

তুই যাস্‌নে—আমার মাথা খাস্‌ ফিরে আয়।' মাতৃহৃদয়ের সে আকুল আবেদনে নিষ্ঠুর ঝড়ের দেবতার প্রাণ ভিজিল না। বাতাস সে কথার প্রতিধ্বনি উল্টাদিকে বুঝিবা কোন দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া দিল, রত্নার কানে গেল না। সে তখন জগন্নাথের পরিত্যক্ত সেই ক্ষুদ্র ডিঙি নৌকায় বসিয়া ঢেউয়ের তালে নাচিতেছে। কতদিন সে স্বপ্নে দেখিয়াছে,—সীমাহারা জল, পর্বত সমান ঢেউ, আর তারি উপরে সে নৌকা চড়িয়া চলিয়াছে। জল তাহার সব চাইতে আপনার, তাহার বাবার—তাহাদের জাতের জলই তো জীবনের লীলাক্ষেত্র। আজ সেই জল তাহাকে ডাক দিয়াছে—সে কি তাহা উপেক্ষা করিতে পারে? ক্ষান্ত তীরে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—'ওরে এখনও ফিরে আয়। আমার কথায় রাগ করে তুই যাস্‌নে রে।......' উন্মত্ত নদীর ডাকে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ ভাসিয়া গেল! ক্ষান্তর মনে হইতেছিল যেন আজ সব দেবতারা একসঙ্গে জোট পাকাইয়া তাহাদের বৃদ্ধবয়সের সম্বল, নয়নের মণি রত্নাকে ফুসলাইয়া লইবার জন্যই এই সব আয়োজন করিয়া বসিয়াছে।

* * * *

তখন সব থামিয়া গিয়াছে। বাতাস ঝিরঝির করিয়া গাছের মাথায় বহিতেছে; নদী ঠিক আগের মতই ঠাণ্ডা ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে; পরিষ্কার আকাশ তারায় ভরা, পূবের একটা বট গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়া চাঁদ সবে উঁকি দিতেছে, এমনি সময়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহে বাড়ী আসিয়া নিবারণ ডাকিল, 'রত্না!' আর কিছু বলিতে পারিল না, অবসন্ন দেহে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া উপরে উঠিয়াই সে জল কাদার মধ্যে শুইয়া পড়িল।

ক্ষান্ত ব্যস্তভাবে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। নিবারণকে একা দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিতে তাহার বাকি থাকিল না! উন্মাদের মত

সে চিৎকার করিয়া উঠিল,—'আঁ তুমি একা ফিরি আলে? ওগো সে যে তোমারে খুঁজতি সেই ঝড়ে……'

নিবারণ লাফাইয়া উঠিয়া তাহার চুলের মুঠো ধরিয়া বলিল,—'কার কথা ক'লি, কেডা আমারে খুঁজতি গেছে? ক' শিগ্‌গির।

'—ওরে, তুমি আমার মাথায় এটটা লাঠির বাড়ি দিয়ে মারে ফেল। আমি রাক্ষসী মা হয়ে তারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিছি।'

নিবারণ গর্জিয়া উঠিল, 'হারামজাদী! আমি তারে কি রকম করে বাঁচাইছি তা তুই একবারও ভাবে দেখলি নে?' বলিয়া একটা ঝাড়া মারিয়া নিবারণ তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। গায়ে তাহার অসুরের মত বল ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের কষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পায়ের তলায় ক্ষান্তমণি মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিল—ভ্রূক্ষেপ করিল না। রোষে ক্ষোভে তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 'ষড়যন্ত্র, শুধু আমারে জব্দ কত্তি সব শালারাই উঠে পড়ে লেগেছে। ন'লি, আজ মর্‌বার এমোন সুযোগ পায়েও বাঁচে ফিরে আলাম শুধু এই শুনতি?'

নিবারণ বাহিরে চাহিয়া দেখিল প্রকৃতি হাসিতেছে। তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল!—'ওরে শালারা, সব যেনো কতো ভালো মানুষ! ভাবছো ছেলের শোকে নিবারণ পাড়োই ছটফট্‌ করে মর্বে, তোমরা মজা করে তাই দেখবা। সে হচ্ছে না। আজ তুর্‌দের সব আশায় ছাই দিয়ে ছাড়বো।' উন্মত্তের মত ছুটিয়া সে নদীর ধারে যাইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ঢেউ নাই, ডাক নাই, নদী ঠিক যেন সেই আগেকার মরা নদী।

'—ওরে তোর্‌ ও ঢঙ দেখে নিবারণ আজ আর ভুলতেছে না; এটটু আগে তা'র ছেলেডারে নিতি কত ফাঁদই না পাতলি—আর

এখন নিবারণের বেলায় ভাল মানুষ, কিছু জানো না? দে আমার ছেলে কঁ'নে লুকোয়ে রাখিচিস্ বার্ করে দে বল্‌তিছি!'

নিবারণ আপন মনে হো হো করিয়া বিকট হাসিয়া উঠিল। সে যেন প্রলাপ চিৎকার, শুনিলে ভয় হয়।—'ও বুঝিছি। তুই সহজে দিবিনে তবে, দেখ মজাডা!' বলিয়া ঝুপ করিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রত্নাকে সে আজ খুঁজিয়া বাহির করিবেই, তা সে সাগরের অতল তলে, হাঙ্গর কুমীরের উদরে অথবা যেখানেই থাকুক না কেন! বিধাতার কঠোর বিধান উল্টাইতে আজ যে ছেলেকে তাহার চাই-ই চাই!

তপোভঙ্গ

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল, কবে ঘটেছিল, নাই বা জানলেন—ধরে নিন আমাদের এই ভারতবর্ষের কোনও পাহাড় জঙ্গল ঘেরা, লোকালয় হতে বহু দূরে—জনমানব শূন্য একটা পর্বত গুহায়। চার দিকে তার জানা-অজানা অগণিত রঙ-বেরঙের ফুলের গাছ, গুহার ভেতরে একটা শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যভাব—কিছুক্ষণ থাকলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়, আর লোকালয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

এই গুহার একমাত্র অধিবাসী সদানন্দ সন্ন্যাসী, মাথায় দীর্ঘ জটা, ঘন দাড়ি আর গোঁপের আবরণ ভেদ করেও বেশ বোঝা যায় সুপুরুষ, পেশী-বহুল দীর্ঘ দেহ—প্রায় ছ' ফুটের ওপর, পরনে বাঘছাল—বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি।

সদানন্দ সন্ন্যাসী কতদিন ধরে এখানে আছেন, কেন আছেন এ সব জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাবেন না—কেন না এসব কিছুই জানা যায়নি। হয়তো চোর, খুনে আসামী, নয়তো ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে এই নির্জনে পালিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। আবার এও হয়তো হতে পারে—ভগবানকে না পেয়ে মোক্ষলাভ না করে তিনি ছাড়বেন না এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কঠোর তপস্যায় রত আছেন। সবই হতে পারে—যা খুশি ভেবে নিন, শুধু এই কৃচ্ছ্র তপস্যারত মৌন সন্ন্যাসী সদানন্দের জীবনের একটি ঘটনা, ছোট্ট হলেও, সদানন্দের জীবনে কি বিপ্লবের ঝড় তুলেছিল তাই আজ আপনাদের শোনাব। আমি কি করে জানলাম? সেটা নাই বা শুনলেন।

ফুলের গন্ধে পাখির ডাকে সদানন্দের ঘুম ভেঙে যায়, যুক্ত করে ভগবানকে প্রণাম করে গুহার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশীর্বাদের মত ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়া এসে সর্বাঙ্গে শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। পাহাড়ের মাথার ওপর সূর্যদেব সবে উঁকি মারছেন, কিছু দূরে ঝরঝর করে ছোট্ট একটা জলপ্রপাত ছোট ছোট পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে মৃদু-মন্দ গতিতে বয়ে যাচ্ছে—তার ওপর পড়েছে সূর্যের প্রতিচ্ছবি; প্রতি মুহূর্তে নানা বর্ণধনুর সৃষ্টি হচ্ছে—সে যে কি, না দেখলে বোঝানো যায় না।

কিছুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থেকে সদানন্দ প্রাতঃকৃত্য সমাধান করতে দূরে অরণ্যে প্রবেশ করলো—না অরণ্য ঠিক নয়, ঘন ছোট গাছপালার ঝোপ বললেই বোধ হয় ঠিক হয়—খানিকটা ঝোপ, আবার খানিকটা ফাঁকা সবুজ ঘাসে ভরা।

কয়েক পা এগুতেই সদানন্দ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল—সামনে ঐ ফাঁকা ঘাসের ওপর একটা ছোট্ট হরিণ-শিশুর ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে—না শুধু মেয়ে বললে তাকে অপমান করা হয়—বনদেবী। মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল সদানন্দ। মেয়েটির পরনে একখানি পাতলা ফিকে নীল রঙের শাড়ী—তার ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে তার দুরন্ত যৌবনের সন্ধান, দুর্বার তার আকর্ষণ।

ঝুপ্ করে সদানন্দ ঝোপের ভেতর বসে পড়লো—কি জানি তার সাড়া পেলে যদি স্বপ্ন ভেঙে যায়—স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু যে হতে পারে সদানন্দ বিশ্বাস করতে পারছিল না। এই নির্জন জনশূন্য স্থানে—এত দিন বাদে একি অলৌকিক মায়া! সদানন্দ ভাবলে হয়তো দেবতারা তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে এই মোহিনী রূপসী মায়াবিনীকে মর্তে পাঠিয়েছেন। পাঠাক! হোক তপস্যার

বিঘ্ন, সদানন্দ আবার গোড়া থেকে শুরু করবে। এক অনাস্বাদিত নূতন অনুভূতি—উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটে, অন্যমনস্ক হয়ে সামনের একটা ছোট চারা গাছ ধরে টান দেয় সদানন্দ, বিনা আপত্তিতে উঠে আসে বৃক্ষ শিশু—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপটা ওঠে নড়ে, আর সেই সঙ্গে স্বপ্নও যায় ভেঙে। ভীত চকিত হরিণশিশু কান খাড়া করে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় পরক্ষণেই তীর বেগে ছোটে—বনদেবী আচমকা চমকে উঠে পড়ে যায় ঘাসের ওপর চিৎপাত হয়ে, ফিকে নীল রঙের শাড়ী স্থানভ্রষ্ট হয়ে ঘাসের ওপর তালগোল পাকিয়ে যায়—গাঢ় অন্ধকারের বুকে বিদ্যুতের ক্ষণিক ঝলক! পর মুহূর্তে মেয়েটি উঠে পড়ে—হাতে তার লম্বা একটা দড়ি—তার অন্য প্রান্ত হরিণশিশুর গলায় বাঁধা। সব নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে—খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি—ছুটতে ছুটতে বলে—'দাঁড়াতো দুষ্টু! আমায় ফেলে দিলি? আজ তোকে মজা দেখাব।'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! পরিষ্কার বাংলা কথা। পর মুহূর্তে হরিণ-শিশু ও বনদেবী দৃষ্টিরেখা পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়, সারা দেহ তার উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে —আশা, দেখা যদি নাই-ই হয়, হয়তো ঐ মধুর কণ্ঠস্বরের একটা ছোট্ট টুকরোও তার কানে ভেসে আসবে……এলো না।

২

এর পরের তিন চার দিনের ঘটনা যেমন করুণ তেমনি মর্মান্তিক। গভীর উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে সদানন্দের দিনরাত্রি

কাটে। আহার নেই নিদ্রা নেই—ভোর থেকে শুধু নিঃশব্দে ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়—যদি আবার দেখা পায়। সদানন্দ ধ্যান করতে বসে, জোর করে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়—পারে না। চোখ বুজে নিরাকার পরম ব্রহ্মের ধ্যান করতে আরম্ভ করলেই—সদানন্দের চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে, সাকার দুখানি নিটোল সুন্দর পা, ফিকে নীল শাড়ী দিয়ে ঈষৎ ঢাকা। চমকে উঠে সদানন্দ গুহার বাহিরে এসে পায়চারি শুরু করে দেয়।

সে দিনও যথারীতি সকাল দুপুর এই ভাবেই কাটল—ব্যতিক্রম ঘটল বিকেল বেলায়। বন-জঙ্গল ঘুরে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছে সদানন্দ—সূর্য তখন পশ্চিমের ছোট পাহাড়টার মাথায় হেলে পড়বার উদ্যোগ করছেন—ম্লান লাল আভা জলের ওপর পড়ে এক বিচিত্র রঙের জাল বুনে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে ঐ ছোট্ট জলপ্রপাতের ওপর দিয়ে, তারি মাঝে একটা পাথরের ওপর বসে পা দুটো জলে ডুবিয়ে জলক্রীড়া করছে মেয়েটি; সদানন্দ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুদূরে একটা ছোট গাছে বাঁধা রয়েছে হরিণ-শিশুটি, সদানন্দের মত সেও হয়তো বিমুগ্ধ ভাবে ওই—জলক্রীড়াই দেখছিল—কে জানে!

হঠাৎ মেয়েটির নজর পড়ে সদানন্দের ওপর—জল খেলা বন্ধ হয়ে যায়, তারপর তাড়াতাড়ি অবিন্যস্ত দুরন্ত শাড়ীটাকে কতকটা সামলে এনে আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ায় সদানন্দের সামনে। সদানন্দের চোখে পলক পড়ে না—এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটে—মেয়েটিই প্রথম কথা বলে—'তুমি তো ঐ-ই পাহাড়ের গুহাটায় থাক, না?'

সদানন্দ কথা বলতে চায়, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না—শুধু মাথা নেড়ে জানায়—হ্যাঁ।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে,—'মাগো, মাথায় কি বিশ্রী জটা আর মুখেও একরাশ দাড়ির জঙ্গল—কষ্ট হয় না ?' এরও জবাব সদানন্দ শুধু মাথা নেড়ে দেয়—'না।'

'তা সন্ন্যেসী মানুষ কোথায় গুহায় বসে জপ তপ করবে, তা না রাতদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও কেনো ? ভগবানকে খোঁজো ?' আবার সেই পাগল-করা হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটা।—সদানন্দ জবাব দেবে কি—অবাক্ চোখে শুধু চেয়েই থাকে।

মেয়েটি ছুটে গিয়ে গাছ থেকে হরিণ-শিশুটাকে খুলে নেয়, তারপর তার কানে কানে সদানন্দকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—'জানিস কানু ! সন্ন্যেসীটা একেবারে বোবা, আমার কথার একটারও জবাব দিতে পারলে না।' আবার সেই হাসি, তারপর চোখের নিমিষে দুজনেই অদৃশ্য। সেদিন এই পর্যন্ত।

পর দিনই একটা ফল-কাটা ছুরি দিয়ে পাথরের ওপর ঠুকে ঠুকে সদানন্দ মাথার জটা যতটা পারলে কেঁটে ফেললে—দাড়িও ছুরি দিয়ে যতটা সম্ভব হাল্কা করে ফেললে—তারপর একরকম বুনো পাতা হাতে ঘসে মাথায় আর দাড়িতে বেশ করে মাখালে রুক্ষ ভাবটা কেটে খানিকটা চকচকে হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে সদানন্দ—'এবার দেখা হলে সে কথা বলবেই, বোবা সন্ন্যেসী এ অপবাদ তাকে ঘোচাতেই হবে।'

দেখা সেই দিনই হল, সন্ধ্যার কিছু আগে। সদানন্দ গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, মেয়েটি হরিণ-শিশুকে নিয়ে একেবারে সামনে এসে হাজির। পরক্ষণেই বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে মেয়েটি বললে—'ওমা, সন্ন্যেসী ঠাকুরের একি মূর্তি ?

'তোমার নাম ?'—জিজ্ঞাসা করে সদানন্দ।

প্রথমটা থতমত খেয়ে যায় মেয়েটা, তারপর হরিণটাকে লক্ষ্য

করে বলে—'জানিস কাদু? সন্ন্যেসীটা বোবা নয়, কথা বলতে পারে।'

'তোমার নাম?'—বজ্র গম্ভীর স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করে সদানন্দ। দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটো সদানন্দের গুরুগম্ভীর মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে মেয়েটি জবাব দেয়—'মুণ্যি!'

'কোথায় থাক?'

'ঐ যে হোথায়, বনের সীমানা পেরিয়ে যেখানটা ঢালু জমি নেমেছে ঐ পাহাড়টার উঁচু ঢিবিটায় উঠলে দেখা যায় টিনের ঘর, সেথায় থাকি।'

এক অজানা উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে সদানন্দের, তবুও সংশয় ঘোচাতে গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'ওখানে তুমি একা থাক মুণ্যি?'

—'ধ্যেৎ, একলা থাকবো কেন, আমি থাকি, আমার মা থাকে, বাবা থাকে, আর থাকে কাদম্বিনী।'

'কাদম্বিনী?' অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে সদানন্দের গলা দিয়ে।

'হ্যাঁ এই তো!' বলে হরিণ-শিশুটাকে আদর করে একটা চুমু খেয়ে বলে—'এই তো কাদম্বিনী, আমি আদর করে ডাকি কাদু! তুমি বুঝি এ অঞ্চলে নতুন এসেছো?'

সদানন্দ বলে—'না, আজ পনের-ষোল বছর, আমি এ গুহায় আছি।'

বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে মুণ্যি বলে—'অ্যাঁ, এতদিন আছো আর আমার বাবাকে চেনো না? আমার বাবাকে এ অঞ্চলের পশুপক্ষী সবাই চেনে আর ভয় করে।'

এ হেন মানুষটিকে না চেনা যে সত্যিই অপরাধ, সদানন্দ মনে মনে স্বীকার করে নেয়, মুখে শুধু বলে—'তোমার বাবার নাম কি? কতদিন তোমরা এ অঞ্চলে এসেছ, আর লোকালয় ছেড়ে এ পাহাড়

জঙ্গলেই বা রয়েছ কেন ?' একসঙ্গে এতগুলো কথা বহুদিন বলেনি সদানন্দ—উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে।

কথা বলার নেশায় মুণ্যিকে তখন পেয়ে বসেছে, সে বলে, 'আমার বাবার নাম গজানন্দ কর্মকার, বাড়ী আমাদের কলকাতার কাছাকাছি একটা গ্রামে—বাবা নাম করতে মানা করে দিয়েছে। আমার বাবা খুব ভাল ছুরি, বর্শা, দা, বল্লম ইত্যাদি তৈরি করতে পারে—একবার এক ডাকাতের সর্দার এসে বাবাকে অনেকগুলো ছুরি আর বর্শার অর্ডার দেয়, পুলিস কি করে জানতে পেরে ভোরে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে। বাবা কিছু আগে খবরটা জানতে পেরে ভোরে আমাকে আর মাকে খিড়কির দরজা দিয়ে সরিয়ে দেয়,—তারপর বাবার মুখে শুনেছি হাপরের আগুনটা বেশ গণগণে করে তার পাশে চুপটি করে বসে থাকে। সুড়ঙ্গ দিয়ে এক একটা পুলিস সেই ঘরে ঢোকে, আর বাবা মুখ বেঁধে হাপরের আগুনে ফেলে দেয়—এই ভাবে ছু' ছুটো পুলিসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে তাদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে বাবা পালিয়ে যায়। তারপর কতদিন কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে আজ ছু' বছর হ'ল আমরা এখানে এসেছি। ওমা সন্ধ্যে হয়ে গেছে ?—আজ বাবার কাছে নিঘ্যাত বকুনি। চল্ কাদু'—বলেই চোখের নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়। সদানন্দ স্থাণুর মত সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রতিধ্বনির মত মুণ্যির কথাগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার সদানন্দের কাছেই ফিরে আসে।

৩

সেদিন রাত্রে সদানন্দ স্বপ্ন দেখলে—প্রকাণ্ড একটা হাপর, চারদিকে তার গণগণে আগুন, তার মধ্যে সদানন্দ—পাশে দাঁড়িয়ে আছে

ভীষণ দর্শন একটা দৈত্য, হাতে তার প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা, যেই সদানন্দ আগুন থেকে বেরুবার চেষ্টা করেছে অমনি সর্বাঙ্গে পড়ে সেই ডাণ্ডা তার মাথায়—অব্যক্ত যন্ত্রণায় সদানন্দ চিৎকার করে ওঠে—আর পাশ থেকে মুণ্যির গলায় কে যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। চিৎকার করে উঠে বসে সদানন্দ, ঘুম ভেঙ্গে যায়—বৃষ্টিধারার মত ভিজে পাথরটা থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ বসে ভাবে সদানন্দ—'ঠিকই হয়েছে, যেমন এ বয়সে তার মতিভ্রম হয়েছিল, ভগবান তাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আর নয়, এবার থেকে আর সে গুহার বাইরেই যাবেনা। আবার ভাবে—মেয়েটার নামটি কি মিষ্টি—মুণ্যি! মুণ্যি—মুণ্যি! প্রলোভন প্রবল হয়ে ওঠে—ভাবে, এও হয়তো হতে পারে যে তারই জন্যে ভগবান একদিন বাদে এই জনশূন্য অরণ্যে মুণ্যিকে পাঠিয়েছেন। এমন বহু মুনি ঋষির কথা সদানন্দ শুনেছে যাঁরা বিবাহ করে সস্ত্রীক পর্বতগুহায় আস্তানা গেড়ে পরমানন্দে জপতপ করছেন—তবে তার বেলাতেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন। চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। সদানন্দের কানে মুণ্যির কথাগুলো ভেসে আসে—গজানন্দ কর্মকার দু' দুটো পুলিসকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। মনটা দমে যায়।

সদানন্দ ঠিক করে ফেলে—আজই এর একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলবে—এ ভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তার জাল বুনে সারা দুপুরটা কাটিয়ে দেয় সদানন্দ। সব ওলোট পালোট হয়ে যায় বিকেল বেলায় মুণ্যির ডাকে। গুহার বাইরে থেকে মুণ্যি ডাকে, 'কই গো সন্ন্যেসী-ঠাকুর! ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ায় সদানন্দ।

উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল কণ্ঠে মুণ্যি বলে—'আমার কানুকে দেখেছ? আজ দুপুর থেকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

আশ্বাস দিয়ে সদানন্দ বলে—'যাবে আর কোথায়, এইখানে কোথাও লতা-পাতা খাচ্ছে।'

তারপর দুজনে মিলে—ঝোপ জঞ্জাল খুঁজতে শুরু করে।

ঘন ছোট গাছের জঙ্গল,—যেতে যেতে দু'জনে গায়ে গা লেগে যায়—মুণ্যি গ্রাহ্য করেনা, সদানন্দের সারা দেহে বিদ্যুৎ ছোটে, মাঝে মাঝে ছোট কাঁটার গাছে মুণ্যির শাড়ী আটকে যায়, বুকের কাপড় যায় সরে, সদানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—লোলুপ চোখ দুটো দিয়ে সে যেন মুণ্যিকে গিলে খায়। চকিতে কাপড় ঠিক করে নেয় মুণ্যি, সদানন্দের দিকে একটা সলজ্জ দৃষ্টি হেনে বলে, 'কই খোঁজো!' আবার খোঁজা শুরু হয়। এই ভাবে ঘণ্টা খানেক কাটে। একটা ছোট ঝোপের মধ্যে কাদুকে পাওয়া যায়, সদানন্দই প্রথমে দেখে। গলার দড়িটা একটা ঝোপের মধ্যে বেশ রকম করে জড়িয়ে অসহায় চোখ দুটো ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে কাদম্বিনী, এক পাও নড়বার উপায় নেই।

দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে সেই দড়ির জট ছাড়িয়ে কাদম্বিনীকে নিয়ে যখন বাইরে ফাঁকায় এসে দাঁড়াল তখন বেলা পড়ে এসেছে, একটা পাথরের ঢিবির ওপর ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে বসে পড়ে মুণ্যি, কোলের মধ্যে কাদম্বিনীকে টেনে নেয়—তার মুখে মুখ ঘষে আদর করে, পিঠে হাত বুলায়। সদানন্দও আজ মরিয়া, সেও চুপ করে বসে পড়ে মুণ্যির পাশে, কথা শুরু করার সূত্র খুঁজে পায় না সদানন্দ—অগত্যা কাদুর পিঠে আদরের ভঙ্গিতে হাত বুলায়—এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটে। হঠাৎ ভারি গলায় ডাকে সদানন্দ—'মুণ্যি!'

চকিতে মাথা তুলে জিজ্ঞাসু চোখ দুটো সদানন্দের মুখের ওপর মেলে তাকায় মুণ্যি। সে চাউনি সইতে পারেনা সদানন্দ। মুণ্যির

দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে কাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে—অজ্ঞাতে হাত দুটো কাহুর পিঠে বোলাতে থাকে।

মুণ্যি বলে—'আমায় কিছু বল্‌বে?'

তেমনি কাহুর দিকে চেয়েই—সদানন্দ বলে—'সুন্দর! এত সুন্দর আমি জীবনে দেখিনি।'

হয়তো লজ্জা পায় মুণ্যি, মুখে শুধু বলে—'ধ্যেৎ!'

সদানন্দ মরিয়া হয়ে বলে যায়—'জীবনে আমার একটি বাসনা শুধু অপূর্ণ রেখেছেন ভগবান—আজ মনে হচ্ছে তাও সফল হবে—তা না হলে ঐ পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার অন্য পথ নেই।' বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সদানন্দের।

মুণ্যি চমকে উঠে—তাকায় সদানন্দের দিকে, তারপর কাহুকে টেনে নেয় আরও কাছে—কিছুক্ষণ দু-জনেই চুপচাপ, তারপর মুণ্যি বলে—'এতদিন চেষ্টা করনি কেন?'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনা সদানন্দ—উত্তেজনায় খপ্ করে মুণ্যির হাত ধরে ফেলে,—'সত্যি? চেষ্টা করলে কি পেতাম মুণ্যি? চুপচাপ থেকনা, বল?' আবেগে গলা কেঁপে ওঠে সদানন্দের।

—'হু-উ' বলে আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নেয় মুণ্যি, কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে আঙ্গুলের নখ খোঁটে, তারপর হঠাৎ কাহুর দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে উঠে কাহুকে টানতে টানতে ছুটতে শুরু করে—কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—চেঁচিয়ে বলে—'তা আমায় বল্লে হবে কি, কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে এসে বাবাকে বলো।' পর মুহূর্তে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধারে হারিয়ে যায় মুণ্যি আর কাদম্বিনী।

সেইখানে ঠায় বসে থাকে সদানন্দ—আনন্দ, বিস্ময় ও উত্তেজনায় সারা দেহ তার কেঁপে কেঁপে ওঠে।

৪

সে রাত্রে জেগে স্বপ্ন দেখে সদানন্দ—দেখে মুণ্যি শুয়ে আছে তার কাছে, একথা সেকথার পর মুণ্যি বলে 'বিয়ে তো করলে সন্ন্যেসী ঠাকুর এবং এর পর যখন ছেলে পিলে হবে, এই ছোট্ট বেদীতে কুলোবে কি ?'

সদানন্দ ভাবে সত্যিইতো—অত ছোট বেদীতে কি হবে ? দু'জনে অনেক গবেষণার পর ঠিক হয়—পাথর কেটে বেদীটা বড় করতেই হবে। তারপর প্রশ্ন ওঠে দুধের, এর সমাধান হতে বেশী দেরী হয় না, গরু পুষতে হবে। এই ভাবে সংসারের খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থা যখন সে করে ফেল্লে তখন ভোর হয়ে এসেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সদানন্দ, প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ঝরণার জলে বেশ করে স্নান করে সদানন্দ, তার পর সেই পাতার রস বেশ যত্ন করে মাথায় ও দাড়িতে মাখে, গুহার একটা ছোট কুলুঙ্গি থেকে নতুন একটা বাঘছাল বের করে—তারপর বহুদিন পরে যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করে মুণ্যিদের বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

প্রায় মাইল দুই হবে, বন শেষ হয়ে যেখানে জমিটা ঢালু হয়ে গেছে—সেইখানে দু'খানি ছোট্ট টিনের ঘর, চার পাশে বাঁশের বেড়া ঘেরা বাগান, নিত্য প্রয়োজনের তরি-তরকারি সব সেখানে আছে। কিছু দূরে ছোট্ট একটা খাল ধীর মন্থর গতিতে আপন মনে বয়ে চলেছে—জলের প্রয়োজন সেইখান থেকে মেটান হয়।

বাঁশের বেড়া ঠেলে ঢুকে পড়ে সদানন্দ, উঠোনের মাঝখানে এসেই থমকে দাঁড়ায়। ছোট্ট একটা চৌকিতে আটহাত কাপড় পড়ে বসে আছে স্বপ্নের সেই বিরাট দৈত্য,—ভয়াল ভীষণ চেহারা, চোখ দুটো জবা ফুলের মত টকটকে লাল, মাথায় একরাশ বাব্‌রি চুল, মুখে প্রকাণ্ড এক গোঁফ্। শুধু—হাতে লোহার ডাণ্ডার বদলে একটা থেলো হুঁকো।

সদানন্দকে দেখে উঠে দাঁড়ায় গজানন্দ কর্মকার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখে নেয় সদানন্দের—তারপর গোঁফের ফাঁক দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—'বোসো ঠাকুর!' কাল মুণ্যির কাছে সব শুনেছি।

বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করে সদানন্দের, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। হঠাৎ হেসে উঠে গজানন্দ কামার—চেহারার মত ভয়ঙ্কর সে হাসি—শুন্‌লে বুকের ভেতরটা যেন ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

হাসির বেগটা কমিয়ে নিয়ে এসে বলে গজানন্দ—'লজ্জা কিসের! ও রকম হয়—নইলে সর্বত্যাগী সন্ন্যেসী মানুষ তুমি—তোমার এ অবস্থা হবে কেন? মুণ্যি বলছিলো তুমি নাকি আবার আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছ?' আরে ছিঃ! এখনও ওসব পাগলামি করতে তোমার লজ্জা করে না ঠাকুর? যাই হোক শোন, আমি এক কথার লোক—নগদ তিরিশ টাকা লাগবে, তার এক পাই কমে হবে না।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না সদানন্দ—এত সহজে গজানন্দ রাজী হবে—এ যে বিশ্বাসের অতীত। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বাঘ ছালের ভেতর হাতটা ঢুকিয়ে দেয় সদানন্দ। খানিক টানা-

টানির পর একটা ময়লা গেঁজ বেরিয়ে আসে, দড়ির পাক খুলে তার ভেতর থেকে গুনে গুনে তিরিশটা রুপোর টাকা বের করে দেয় গজানন্দের হাতে। গজানন্দ গজেন্দ্র গমনে ভেতর চলে যায়।

বিমূঢ় সদানন্দ শুধু ভাবে—স্বপ্ন নয় তো ? হে ভগবান এত দিন পরে যদি মুখ তুলে চেয়েছ, কঠোর সাধনায় যখন তুষ্টই হয়েছ—তখন আবার নির্মম হয়ে সব স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে দিও না প্রভু। আর একবার ভক্তিভরে সেই অজানা ছলনাময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে সদানন্দ। চমক ভাঙে গজানন্দের কথায়—'অন্য কেউ হলে পঞ্চাশের এক পয়সা কমে রাজী হতাম না, নেহাৎ সন্ন্যেসী মানুষ, শাপ মুন্যি দেবে—তাই।' বলতে বলতে কাছে এসে দাঁড়ায় গজানন্দ। তারপর বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতভম্ব সদানন্দের হাতে একটা দড়ি জড়িয়ে দেয়। স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে দেখে সদানন্দ তার অপর প্রান্তে বাঁধা আছে কাদু, কাদম্বিনী।

LIBRARY.

রেয়াজুদ্দীনের গলি

দিন

চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে উত্তরমুখো কিছুদূর এগুলেই পড়ে বাজার, বাজারের পূর্ব দিক দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে—সেটা একটু গিয়েই অক্টোপাশের মত অনেক-গুলো ছোট গলির মওড়া আগলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওখানে দাঁড়িয়ে সামনে আশে-পাশে তাকালেই নজরে পড়ে অসংখ্য টিনের চালা, অক্টোপাশের যে কোনও একটা সরু ঠ্যাং ধরে এগিয়ে গেলেই রাস্তার মাঝখানে গিয়ে পড়া যায়। সরু পথের দু'পাশে হাতখানেক উঁচু হাত দুই চওড়া বারান্দা, তার পর ঘর। দেওয়াল-গুলো ইটের পাকা গাঁথনি—ওপরে করোগেটের টিন দিয়ে ছাওয়া, এক ছাঁচের লাইনবন্দী ঘর, নতুন লোকের পক্ষে দু-এক দিনে চিনে রাখাই দুষ্কর। দিনে এ গলিতে ঢুকলে মনে হবে ঘুমন্ত নিরীহ জনমানবহীন ছোট খাটো একটা গ্রাম, রাতে এর চেহারা একদম বদলে যায়। নিয়মের বল্‌গা-ছেঁড়া নানা জাতের অগুণতি স্ত্রী-পুরুষের উন্মাদ মাতামাতিতে এর ওপরের ছোট্ট আকাশের তারা-গুলোও বোধ হয় লজ্জায় ম্লান হয়ে যায়। এদের ছোট্ট সীমাবদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে বাইরের জগতের কোনও সাদৃশ্যই নেই। এখানে রাতই দিন—দিনই রাত। এখানকার বাসিন্দাদের একটা মস্ত গুণ, কোনও কিছুতেই এরা অবাক্ হয় না। চুরি ডাকাতি রাহাজানি খুন—সব এদের গা-সওয়া, নিত্য-নৈমিত্তিক ঘরোয়া ব্যাপার এবং এর কোনও একটা না ঘটলেই এরা অস্বস্তিতে নিশপিশ করে।

এই হল চট্টগ্রামের বিখ্যাত পতিতালয় রেয়াজুদ্দীনের গলির বাইরের খোলস—সমগ্র পরিচয় নয়, আংশিক ভূমিকা মাত্র। এর অন্য নাম হল চোদ্দ নম্বর গলি, বোধ হয় অক্টোপাশের চোদ্দটি সরু লিকলিকে গলির মত ঠ্যাং একে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বলে—নয়তো অন্য কারণও থাকত পারে, আমার জানা নেই।

মাঝখানের অপেক্ষাকৃত চওড়া গলি বেয়ে পুব দিকে একটু এগুলেই ডান*দিকে পড়বে উঁচু রকওলা বেশ বড় একখানা টিনের বাড়ী, ছবির মত ঝকঝকে তকতকে।—বাইরের ঘরটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই সামনে ছোট্ট একটা উঠোন, তার চার পাশ দিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট কামরা ঘর। আর এই পায়রার খোপে বাস করে, বেঁচে থাকবার নামে তিলে তিলে দগ্ধে-মরা চোদ্দ-পনেরটি ছুর্ভাগা মেয়ে, বয়েস ষোলো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত—নানা জেলা থেকে আমদানি হলেও—বাঙালী।

মতি বাড়ীউলির এইটেই হোলো হেড কোয়ার্টার্স। অন্য যে তিন চারটে বাড়ী, সেগুলো চলে মাইনে-করা লোক দিয়ে—বাড়ী-উলি শুধু মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

হেড কোয়ার্টার্সের চার্জও অন্য বাড়ীর তুলনায় বেশী। এ বাড়ীর খদ্দের হোলো বেশীর ভাগই ব্যবসাদার মুসলমান—স্থানীয় ছু-একটি ছাড়া বাইরের লাখপতি খদ্দেরের খাতিরই এখানে বেশী। সুদূর বর্মা, সন্দ্বীপ এমন কি মাঝে মাঝে ঢাকা থেকেও ব্যবসা উপলক্ষে বড় বড় মহাজন এ বাড়ীর অতিথি হয়ে ধন্য হয়ে যান।

অন্য বাড়ীগুলোতে এ আভিজাত্য নেই—সেখানে কসমোপলিটন ব্যবস্থা, সব জাতের মেয়েদের এক সঙ্গে জড়ো করে এক ভয়াবহ জগাখিচুড়ী, মানুষের চিড়িয়াখানা!

মতি বাড়ীউলির আসল নাম কেউ জানে না—হয়তো কোন্ সুদূর অতীতে মতি বলে এক ভাগ্যবতী মেয়ে সত্যি অল্প ক'দিনের জন্য মতির মায়ের মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটাতে এসেছিল—হয়তো কথাটা আগাগোড়াই মিথ্যে বানানো—কিন্তু এটা খুব সত্যি যে রেয়াজুদ্দীনের গলিতে মতির মায়ের আবির্ভাবের পর থেকেই পরিচিত অপরিচিত সবার কাছে ঐ একটা মাত্র নামই শোনা যেত—মতির মা। মতির মা'র আশ্রিতা মেয়েরা আসলে ডাকে মাসিমা—পেছনে বলে ডাইনী। কোনও কোনও মেয়ে প্রথম প্রথম দয়ামায়াহীন ঐ ডাইনীর স্নেহলাভের আশায় সাহস করে ডেকেছিল মা! আর যায় কোথায়—তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে অনর্থ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল মতির মা—সবাইকে ডেকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল—কোনও দিন ভুলেও যেন কেউ মা বলে না ডাকে ;—তার পর থেকে আর কেউ কোনও দিন সে আদেশ অমান্য করতে সাহস পায়নি।

মতির মায়ের অসীম দাপটে, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল না খেলেও রেয়াজুদ্দীনের গলির কোনও গুণ্ডা বদমাশের সাহস হ'ত না মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেবার।

মহাদেবের নন্দী-ভৃঙ্গির মত কেলো আর নেলো ছিল মতির মার ডান-হাত বাঁ-হাত। কেলোর বিরাট দেহ—প্রায় সাত ফুট উঁচু, কালো মিশমিশে যমদূতের মত চেহারা, সব সময় মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে জড়িয়ে জড়িয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে—যার অর্থ এক মতির মা ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না—এক কথায়, কেলোর পরিচয় হোলো খেয়ালী বিধাতা প্রকাণ্ড এক সিমপানজি গড়তে গড়তে রসিকতা করে মর্তে মানুষের মাঝে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

এর ঠিক বিপরীত হোলো নেলো—ছিপছিপে চেহারা, গায়ের

রঙ ফর্সা, মুখে ঈষৎ গোঁপের আভাস—সব মিলিয়ে সুপুরুষ বলা চলে, পরনে দামী লুঙ্গি, তার ওপর ফিন-ফিনে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি, কোমরে লুঙ্গির সঙ্গে গোঁজা চকচকে একখানা মাঝারি ছুরি, পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে সেটা আরও ভয়ানক দেখায়, রেয়াজুদ্দীনের গলিতে কিন্তু ভয় করে সবাই কেলোর চেয়ে নেলোকেই বেশী। কম কথা কয়, চটপট ছুরি চালায়—হাতও কাঁপে না, মুখের ভাবেরও কোনও পরিবর্তন হয় না, আর নেলোর ছুরি খেয়ে যদি কেউ দৈবাৎ বেঁচে যায় তাহলে তার পরমায়ুর জোর আছে বলতেই হবে। মোট কথা এ দুটি জগাই-মাধাই মিলে সমস্ত গলিটাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। কেলো-নেলোর সত্যিকার পরিচয় কি, কি জাত, দেশ কোথায়, পেছনের ইতিহাসই বা কি—কেউ জানে না—জানে শুধু মতির মা। একটু বেয়াড়াপনা দেখলেই মতির মা শুধু একটা হুঙ্কার দিয়ে ডাকে, আর অমনি পোষা কুকুরের মত দুটিতে ভয়ে কুঁকড়ে মুখ নিচু করে কাছে এসে ন্যাজ নাড়ে।

দুষ্টু লোকে কানাঘুষো করে—মাসে মাসে মোটা টাকা মতির মা থানার বাবুদের খাওয়ায়, তাই ও অতখানি বেপরোয়া। কথাটা হয়তো সত্যি, হয়তো নয়, কিন্তু এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, নতুন শিকার ধরে এনে থানার বাবুদের পূর্ণ সম্মতি না নিয়ে সাধারণের জন্য দরজা খোলে না মতির মা।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ একটু সকাল সকাল হেড কোয়ার্টার্সে কেমন একটা কর্মব্যস্ততার ভাব দেখা গেল—ভেতরের ছোট্ট উঠোনটা থেকে ভেসে এল একাধিক নারীকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন। উঠোনে কলতলায় দেখা গেল ছ'-সাতটি মেয়ে প্রায় অনাবৃত দেহে গায়ে-মুখে সাবান মাখছে, উঠোনে চার পাশের লাল সিমেন্টের বারান্দায় বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে বসে ঘুমুচ্ছে আরও চার পাঁচটি

মেয়ে! বোধ হয় এই বিনিদ্র রজনীর কিছুটা খাঁকতি পূরণের আশায়, এদের সবাইকে ছাড়িয়ে প্রথমেই নজরে পড়বে ফুটফুটে চাঁপা ফুলের মত রং একটি আঠারো উনিশ বছরের অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে এক পাশে বসে বিষাদ-মলিন মুখে সাবান মাখতে মাখতে উন্মনা হয়ে বহু দূরে দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে বসে আছে, একটু কাছ থেকে দেখলে মনে হবে অনিদ্রায় ও অত্যাচারে এর দেহ-দরিয়ায় লাবণ্যের জোয়ারের ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের একটি মেয়ে মুখে সাবানের ফেনায় ভর্তি একটি মেয়ের পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে চাপা গলায় বলে—'ওলো সাবি! লক্ষ্মীর রকমটা একবার ছ্যাখ।' ফেনা-ভর্তি মুখে তাকাতে গিয়ে চোখ জ্বালা করে ওঠে সাবিত্রীর ; তাড়াতাড়ি বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে মুখের সাবান তুলে ফেলে ; তারপর পিট-পিটে চোখে লক্ষ্মীর দিকে ঝুঁকে দেখে নিয়ে বলে—'ওসব আদিখ্যেতা, রঙটা কটা বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।' আগের মেয়েটির নাম কমলা, বলে, 'ছাই রঙ, বলি, আমি যখন এ বাড়ীতে আসি, কি বলেছিলো সবাই?' কেউ কোনো জবাব দিলো না দেখে নিজেই শুরু করে আবার—'তোরাই বা জানবি কি করে, সে কি আজকের কথা! রেয়াজুদ্দীনের গলির সবাই একবাক্যে বলেছিল—'মতির মা এদ্দিনে একটা মেয়ের মত মেয়ে এনেছে, তবুও যদি না রংটা একটু চাপা হত।' এবার মেয়েদের মধ্যে একটা অস্ফুট চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। কমলা তাচ্ছিল্যভরে চারদিক দেখে নিয়ে কালো আবলুস কাঠের মত হাতখানায় দ্বিগুণ জোরে সাবান ঘষতে সুরু করে। টগর মেয়েটির গলা ভাল, দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে নিদ্রাক্রান্ত চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য জোর করে খুলে উঠোনে তাকিয়ে নেয়, আবার চোখ বুজে গুন্-গুন্ শুরু করে—

"এবার নতুন প্রেমেতে তোমার—
যতন বেড়েছে।"

স্থান-কাল ভুলে একসঙ্গে সবাই অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে খিল-খিল করে হেসে ওঠে, পরক্ষণেই হাসি থামিয়ে সভয়ে বাড়ীউলির ঘরের দিকে তাকায়। যার উদ্দেশে এদের এই হাসি-ঠাট্টার বিষোদ্‌গার সেই লক্ষ্মী কিন্তু ঠায় বসে থাকে—এ-সব তার কানে যায় কিনা বোঝা যায় না, গেলেও গ্রাহ্য করে না। সে তখন রেয়াজুদ্দীনের গলি ছাড়িয়ে চিটাগং শহর ছাড়িয়ে চলে গেছে দূরে, বহু দূরে ছোট্ট একটি পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামে। লক্ষ্মীর অত্যাচারক্লান্ত কালি-পড়া চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখন তিন দিকে ধানের ক্ষেত, পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা পুকুর, তারি মাঝে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট ছবির মত একখানা বাড়ী, তিন পোতায় তিনখানা গোলপাতার ছাওয়া ঘর, মাঝখানে উঠোন, গোবরজল দিয়ে নিকানো ঝকঝকে তকতকে সিমেণ্টের মেঝের মত পরিষ্কার এক পাশে ধানের গোলা, তার কাছেই গোয়াল ঘর, এই তো সেদিন এক বছর আগে লক্ষ্মী প্রথম এই বাড়ীতে আসে নব-বধূ বেশে। বেশ মনে আছে গাঁ সুদ্ধ সবাই বউ দেখে লক্ষ্মীর ধন্য-ধন্য করতে লাগলো, বিধবা ননদ জড়িয়ে ধরে লক্ষ্মীকে নিয়ে গেল পুবের পোতার উচু বারান্দাওলা ঘরটায়··

সুর কেটে গেল, লক্ষ্মীর কানে এলো কমলা তাকে উদ্দেশ করে বলছে, 'হ্যালা লক্ষ্মী, তোর মতলবখানা কি বলতো? বাড়ীউলি পই-পই করে বলে দিয়েছে পাঁচটার আগে গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় পরে রেডি হয়ে নিতে—ঠিক ছটায় ওসমান সাহেব আসবে সে হুঁস আছে? রাত-দিন কি অত ভাবিস লা?' টগর মেয়েটির সব কথায় ছড়া কেটে বা গান গেয়ে কবিত্ব করা অভ্যাস। খুঁটি ছেড়ে

উঠে দাওয়ায় বসে উঠোনে পা ঝুলিয়ে বসে, অতিরিক্ত পান-দোক্তা-খাওয়া পচা চিংড়ি মাছের খোলার মত তু'পাটি দাঁত বের করে বলে ওঠে—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' বাড়ীউলির ভয়ে বা কি কারণে জানি না, এবার আর কেউ হাসলো না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্লান মুখে লক্ষ্মী মুখে-হাতে সাবান মাখতে লাগলো।

নেপথ্যে মতির মার নিদ্রাজড়িত হেঁড়ে গলায় আওয়াজ ভেসে এলো, 'কি লো গতরখাকীরা, গা ধোয়া হল ? বেলা যে গড়িয়ে গেলো।' তাড়াতাড়ি এক বালতি জল গায়ে ঢেলে সাবিত্রী গলায় মধু ঢেলে বলে, 'এই যে হোলো মাসিমা!' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, শুধু সাবান মাখা আর মাঝে মাঝে জল ঢালার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। লক্ষ্মী ভাবছিলো, আঙুলে গোণা যায় কটা দিন ছাড়া এই এক বছরের মধ্যে প্রায় রোজই তাকে নিয়ে চলে লালসার এই ঘৃণ্য মাতামাতি, পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া এ বাড়ীতে কেউ প্রবেশাধিকার পায় না, তারা সবাই এসে পছন্দ করে বসে লক্ষ্মীকেই, এর জন্য অন্য মেয়েদের হিংসার অন্ত ছিল না, কথাও কম শুনতে হত না লক্ষ্মীকে, যেন সব দোষ তারই। লক্ষ্মী ভাবছিল, আজ এক বচ্ছর টাকাও ত কম রোজগার হয়নি, কিন্তু তাতে লক্ষ্মীর কোনও অধিকার নেই, সব গিয়ে উঠেছে বাড়ীউলির ঘরে ছোট লোহার সিন্দুকে। সেবার কি একটা দরকারে কটা টাকা চেয়েছিলো লক্ষ্মী, ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলো বাড়ীউলি—'টাকা, টাকা রাস্তার খোলামকুচি কিনা, চাইলেই পাওয়া যায়। এই যে তোকে থাকবার ঘর দিয়েছি, তু'বেলা খেতে দিচ্ছি, পরতে দিচ্ছি, এর দাম কে দিচ্ছে? সেই যে মাস তিনেক আগে চার পাঁচ দিন জ্বরে ভুগলি —ডাক্তার, ওষুধ-পত্তোর এই সব মিলে আমার যে জলের মত এক

কাঁড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল কে দিচ্ছে সে টাকা ?' এর পর আর কোনও দিন টাকা চায়নি লক্ষ্মী।

তিন-চারটে মেয়ে গা ধুয়ে উঠে গেল—আরও চার-পাঁচ জন এসে বসলো, লক্ষ্মী ভাবছিল তার পোড়া অদৃষ্টের কথা। খুব ছোটবেলায় মাকে হারায় লক্ষ্মী, বাবা আবার বিয়ে করলো—কয়েক দিনের মধ্যেই সৎমার চক্ষুশূল হয়ে উঠলো লক্ষ্মী, বাবাও যোগ দিল সৎমার সঙ্গে, তারপর শুরু হল কারণে অকারণে নির্যাতন—যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ একদিন কি করে যেন বিয়ে হয়ে গেল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল লক্ষ্মী, তারপর শ্বশুর-বাড়ী···

সেই ছোট্ট গ্রামে ছবির মত বাড়ীটা চুম্বকের মত টানতে লাগলো লক্ষ্মীকে—অনেক চেষ্টা করেও মন থেকে বা চোখ মুছে ফেলতে পারে না, সাবান মাখা বন্ধ করে আবার স্থান-কাল—বাড়ীউলির কড়া শাসন সব ভুলে তন্ময় হয়ে যায় লক্ষ্মী।

ঐ সুন্দর মুখ আর কটা-কটা রং, ওই তার কাল হয়েছিল, স্বামী আদর করে ডাকত রাঙাবৌ, নিষ্ঠুর বিধাতা সব দিয়ে অদৃষ্টের কোঠায় শূন্য দিয়ে মহাশূন্যে বসে মজা দেখছিলেন। শ্বশুরবাড়ীর ঘাটে-পথে নতুন বৌ-এর চেহারার সুখ্যাতি আর ধরে না, কয়েক দিনের মধ্যেই লক্ষ্মী বেশ বুঝতে পারলো—সে সুখ্যাতি শুনে শ্বাশুড়ী-ননদের মুখ হাঁড়ির মত গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর স্বামীও যখন ক্ষেত-খামারের কাজে ফাঁকি দিয়ে ছুতোয়-নাতায় যখন তখন নতুন বৌ-এর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো তখন ওদের ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে গেল। প্রথম প্রথম বাক্য-জ্বালা। যথা—ও রকম পটে-আঁকা বিবি নিয়ে আমাদের চলবে না। এ হ'ল গরীব-গেরস্থের সংসার, কাজ-কর্ম করতে হবে, নীরবে লক্ষ্মী গোয়ালে গরুর কাজ থেকে শুরু করে উঠোনে গোবর নিকোনো

পর্যন্ত সব করতে শুরু করে দিল—যদি তাতে ওদের খুশি রাখতে পারা যায়। কিন্তু হায় রে 'কপালে নেইকো ঘি, ফোঁস ফোঁসালে হবে কি', লক্ষ্মীর সব কাজের ত্রুটি বেরুতেও দেরী হ'ল না। ছুতোয়-নাতায় গালাগালি, এক বেলা খাওয়া বন্ধ, এই ভাবে চললো কিছুদিন, সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকতো—বেশীর ভাগ দিন তাই দিয়ে আধপেটা খেয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে বেলা প্রায় তিনটের সময় পুকুর-ঘাটে গিয়ে মাজতে বসতো লক্ষ্মী। বাসন মাজে আর নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে কাঁদে, একদিন একটু ব্যতি-ক্রম দেখা গেল। বাসন মাজতে মাজতে লক্ষ্মীর কানে এলো—'কৈ গো, তুমি বুঝি এ বাড়ীর নতুন বৌ?' চোখের জল সামলে নিয়ে ঘোমটা টেনে ছ্যায় লক্ষ্মী, তারপর ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। প্রৌঢ়া মেয়েটি কাছে এসে বসে। লক্ষ্মী ভাবতে চেষ্টা করে একে কোনও দিন দেখেছে কিনা—অনেক ভেবেও মনে করতে পারে না, মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় প্রৌঢ়া বলে,—'আমায় চিনবে না বাছা, আমি ভিন গাঁয়ে থাকি, এ পথ দিয়ে আমার মেয়ের বাড়ী যাই। তাই ভাবলাম এত সুখ্যাতি শুনিছি তোমার, এক বার দেখেই যাই।'

চুপ করে থাকে লক্ষ্মী। প্রৌঢ়া বলে যায়, 'আহা অমন ননীর মত হাতে কি বাসন মাজা সাজে? কোথায় রাজরাণী হবে—তা না, পড়েছো এক হাড়-হাবাতে চাষার ঘরে।'

কোনও জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে চলে যায় লক্ষ্মী। প্রায় রোজই দুপুরে আসে মেয়েটি, লক্ষ্মীর জীবন-মরুতে সোনার ফসল বুনে চলে যায়, আবার আসে, সেদিনও নিত্য-নৈমিত্তিক বাসন মেজে উঠোনে এসে দেখে মুখ তোলো করে বিধবা ননদ গোলার কাছে দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মী কাছে আসতেই ঝঙ্কার দিয়ে

বলে উঠলো—নতুন বৌ! পুকুরঘাটে কার সঙ্গে রোজ ফুস্‌সুর ফুস্‌সুর করো?

লক্ষ্মী জবাব ছ্যায়, আমি চিনিনে দিদি, বলে ভিন গাঁয়ে বাড়ী, এই পথ দিয়ে ওর মেয়ের বাড়ী যায়।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ননদ, এই সব আমাদের বিশ্বাস করতে বল? ততক্ষণে দিবানিদ্রা সেরে শাশুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে মেয়ের পাশে। মাকে দেখে গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে মেয়ে বলে, শুনলে মা, গতরখাকীর কথাটা এক বার শুনলে? ও মাগীটা হল কুটনী, আড়কাঠি। গেল বছর চৌধুরীপাড়ার নতুন বৌটার সঙ্গেও পুকুরঘাটে ক'দিন ওকে ফুস-ফুস করতে দেখা গিয়েছিল, তার কয়েক দিন পরেই বৌটা গাঁ থেকে উধাও। এদ্দিন পরে আবার উদয় হয়েছে।

এর পর আর কথা নয়, লক্ষ্মীর ওপর চলে অমানুষিক মার-ধোর গরম হাতার ছেঁকা। সব মুখ বুজে সয়েছিল লক্ষ্মী, মেরুদণ্ডহীন অসহায় স্বামীর মুখ চেয়ে। বেচারা রায়বাঘিনী মা ও বোনকে যমের মত ভয় করে, তাদের কথার ওপর কথা বলতে পারে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাঠে হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বাড়ী ফিরতেই লক্ষ্মীর স্বামীকে মা আর বোন মিলে অনেক করে ঘাটের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে, বৌএর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। শিগগির একটা কেলেঙ্কারি করে ও নিশ্চয় সবার মুখে কালি লেপে দেবে।

হঠাৎ কিসে কি হয়ে গেল, স্বামীকে এ রকম রাগতে কোনও দিন দেখেনি লক্ষ্মী। হঠাৎ ঘরে ঢুকে কিল চড় লাথি, তার পর চুলের মুঠো ধরে ধাক্কা দিতে দিতে ঘর থেকে দাওয়ায় এনে লাথি মেরে উঠোনে ফেলে দিয়ে বললে, দূর হয়ে যা—আর কোন দিন বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিসনে। তার পর খিল লাগিয়ে দিলে ঘরে।

এর পরের ঘটনাগুলো লক্ষ্মীর স্বপ্ন বলে মনে হয়, সমস্ত দেহ-মন ব্যথায় টনটন করছে, এক পা দু'পা করে লক্ষ্মী দক্ষিণের ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে বাপের বাড়ীর পথ ধরে। একটু গিয়েই দেখা হয়ে যায় সেই প্রৌঢ়া মেয়েটির সঙ্গে, কোনও কথা বলবার দরকার হয় না, আর একটু গিয়েই একখানা গরুর গাড়ীতে দু'জনে উঠে বসে, সারারাত কেটে যায়, পরদিন বেলা দশটা এগারটায় পৌঁছে যায় রেয়াজুদ্দীনের গলি…

দড়াম করে প্রচণ্ড লাথি পরে লক্ষ্মীর পিঠে, মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে. কোনও মতে সামলে নেয় লক্ষ্মী। সঙ্গে সঙ্গে মতির মার গলা শোনা যায়—'নবাবের বেটী! সাবান মাখতে মাখতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, সন্ধ্যে হয়ে এল সে খেয়াল আছে?'

মনে হয় হাড়-পাঁজরাগুলো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কোন মতে মুখ-হাত ধুয়ে টলতে টলতে নিজের খোপে গিয়ে ঢোকে লক্ষ্মী।

রেয়াজুদ্দীনের গলিতে তখন আসন্ন রাতের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাত

সারা দিন ধরে পাট ওজন বিক্রি শেষ করে গেঁজেভর্তি টাকা কোমরে গুঁজে বড় রাস্তায় এসে যখন দাঁড়াল শোভান, কোতোয়ালির পেটা ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে। সারা দিনে চড়া দরে পাট বিক্রির নেশায় খাওয়ার কথা মনেই হয়নি, এখন মনে হল খিদেয় পেটের বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে উঠছে, এক পা দু'পা করে বাজারের পথ ধরলো শোভান। একটু গিয়েই প্রতিবেশী জয়নালের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। শোভান দেখতে পায়নি, জয়নালই শোভানকে

দেখে কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বলে—'কি মিঞা, না হয় মোটা টাকার পাটই বিক্রি করেছ, তাই বলে গরীব দোস্তদের চোখেই দেখতে পাও না ?' লজ্জা পেয়ে শোভান বলে, বড্ড খিদে পেয়েছিল, তা ছাড়া আমার ধারণা, পাট বিক্রি করে তুমি অনেক আগেই গাঁয়ে ফিরে গেছ। শোভান ও জয়নাল প্রায় সমবয়সী, বয়েস চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না।

কথা চাপা দিয়ে জয়নাল বলে, 'এবার সব চেয়ে বেশী জমিতে পাটের চাষ করেছিলে তুমি, তখন সবাই হেসেছিল,—তা কত বিক্রি হোল দোস্ত ?' লুঙ্গির ওপর দলা পাকানো ছিটের সার্টটার নিচে কোমরে জড়ানো গেঁজে-ভর্তি টাকাটার ওপর হাত বুলিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে শোভান বলে—'তা শ' তিনেক হবে। গেল দু'বছর ধরে যে লোকসানটা দিয়েছি জানতো দোস্ত, এবার বোধ হয় সুদসুদ্ধ পুষিয়ে যাবে। বাড়ীতে ও ক্ষেতে যে মাল এখনও আছে তা বেচলে আরও শ পাঁচেক হবে। খোদাতাল্লা এবার সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার কত হোল ?'

মুহূর্তের জন্য ঈর্ষায় চোখ দুটো জ্বলে ওঠে জয়নালের, পরক্ষণেই সামলে নিয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে জবাব দেয়—যেতে দাও ভাই, আমরা হলাম আদার ব্যাপারী, তুমি হলে মানোয়ারী জাহাজ। নিজের রসিকতায় হো-হো করে অকারণ হেসে ওঠে জয়নাল। একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধ পায় শোভান, একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি সরাব খেয়েছ জয়নাল মিঞা ?'

—'হ্যাঁ খেয়েছি, হাজার বার খাব, আমরা খাই বলেই ত গরীবের দোকান চলে।' উচ্ছ্বাস একটু থামিয়ে শান্ত ভাবে বলতে শুরু করে জয়নাল, 'সারা বছর ক্ষেতে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটব, খামখেয়ালি খোদাতাল্লা কখন মুখ তুলে চাইবেন তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই,

শুধু চোখবাঁধা বলদের মত খাটুনীই সার ; সাধে আর ভদ্রলোকে আমাদের হেলে চাষা বলে গাল দেয় ?' জয়নালের সরাব খাওয়ার সঙ্গে খোদাতাল্লার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে ভেবে ঠিক করতে পারে না শোভান—চুপ করে থাকে।

নিজের মনেই বলতে শুরু করে জয়নাল, 'এত দিনে মনে হচ্ছে যেন সারা বছরের খাটুনী উস্থল হয়ে গেল। হঠাৎ শোভানের হাত ধরে একটা টান দিয়ে বলে,—'এস দোস্ত।' অবাক্ হয়ে শোভান জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় ?' কোনও উত্তর না দিয়ে এক রকম টানতে টানতে নিয়ে চলে জয়নাল। বড় রাস্তা থেকে একটু ডান দিকে এগুলেই দেশী মদের দোকান, প্রতিবাদ করবার আগেই শোভান দেখলে জয়নাল তাকে দোকানের ভেতরে নিয়ে এসেছে। অসংখ্য খদ্দের, বেশীর ভাগই চাষী-মজুর, ভদ্রলোক নেই বললেই চলে। শোভান সবিস্ময়ে দেখলে আপে-পাশের গাঁয়ের চেনা লোকও দু'-একজন রয়েছে, সবাই পাট বেচতে শহরে এসেছে। ছোট্ট ঘরে মাত্র দুখানা বেঞ্চি পাতা, অনেকে স্থানাভাবে মেঝেয় বসতে শুরু করেছে। জয়নাল ঠেলে ঠুলে ঐ বেঞ্চির একপাশে কোনও রকমে শোভানকে বসিয়ে দিল। তারপর ভিড় ঠেলে সামনে উঁচু টেবিলটা যার ওপর অগুন্তি ছোট-বড় দেশী মদের পাঁইট বোতল সাজান রয়েছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল।

সবার অলক্ষ্যে কোমরে বাঁধা গেঁজেটায় হাত দিয়ে দেখে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে শোভান। বেশীক্ষণ বসতে হয় না, এক হাতে ছোট দুটো কাচের গ্লাস অন্য হাতে বড় একটা বোতল নিয়ে জয়নাল তখুনি এসে শোভানের সামনে মাটিতে উবু হয়ে বসে। তার পর বোতল থেকে দুটো গ্লাসে সমান করে সাদা জলের মত মদ ঢেলে একটা এগিয়ে দ্যায় শোভানের দিকে, অন্যটা হাত করে বলে,—

'সামনের বছরও যেন পাটের বাজারে এমনি আগুন লেগে যায়।' তার পর নিমেষে গ্লাসটা উঁচু করে গলায় ঢেলে ছায়। আশে-পাশে চার পাঁচ জন আনন্দে জয়নালকে সমর্থন করে বোতল উঁচু করে খেতে শুরু করে, শোভান গ্লাস হাতে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকে। দু'-একবার গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই একটা বিকট উগ্র গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেয়। দু'-একজন সাহস দিয়ে বলে,—'নতুন বুঝি ?'

হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠে শোভান—আবার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে যেন সে অসহায় শিশু—জোয়ান মরদ হয়ে এ অপমান সহ্য করা যায় না। চট্ করে গ্লাসটা মুখে তুলে জয়নালের মত সবটা ঢেলে দেয় গলায়, তার পর বিষম খেয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাশতে শুরু করে, মনে হয়, গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলে গেছে, কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। জয়নাল চট করে উঠে গিয়ে দু' পয়সার ছোলা-সেদ্ধ কিনে এনে শোভানের হাতে দিয়ে বলে, চারটে মুখে ফেলে দাও। তাই করে শোভান, একটু পরে ধাক্কা সামলে হাঁপাতে থাকে—ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে—নিচু হয়ে ছিটের সার্টটা দিয়ে মুখ মুছে নেয়।

পরের ভোজটায় আর তেমন কষ্ট হয় না। শুধু মুখটা বিকৃত হয় গেলবার সময়, তার পর ছোলা-সেদ্ধ দুটো মুখে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায়। শোভানের মনে হয় নতুন জীবন লাভ করেছে সে। সকাল থেকে কিছু খায়নি, কই সে জন্যে তো আর কষ্ট হচ্ছে না। শোভানের মনে হচ্ছিল এখন তাকে দুটো বলদ ও একটা লাঙ্গল দিলে অনায়াসে এক বিঘে জমি চষে ফেলতে পারে। আধ ঘণ্টা পরেই কোমরের গেঁজে থেকে কতকগুলো টাকা বের করে জয়নালকে দিয়ে বলে, 'আর একটা বোতল নিয়ে এস দোস্ত। তুমি ঠিকই

বলেছ—সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাঝে মাঝে একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার'। বোতল নিয়ে মেঝের ওপর জাবড়ে বসে পড়ে, বেঞ্চির ওপর আরাম করে বসা যায় না, শোভানও নেমে জয়নালের পাশে মেঝেতে বসে, তার পর নিজেই ঢালতে শুরু করে বোতল থেকে। ছেলেবেলা থেকেই গলার সুখ্যাতি ছিল শোভানের, গুন্ গুন্ করে শুরু করে—

ওরে লাজের মামু চল না যাই ঘরে
ওরে কাজ নেই, কাজ নেই কো তোমার
কচুপোড়ার রোজগারে
লাজের মামু চল না ঘরে ॥

মত্ত উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে ঘরসুদ্ধ সবাই—সাবাস দোস্ত! গলা ছেড়ে; একজন অযাচিত হয়ে পাশে বসে নিজের বোতল থেকে শোভানের গ্লাসে ঢেলে দেয় সরাব, এক চুমুকে শেষ করে আবার শুরু করে শোভান—

বন্ধু আইল ফাগুন মাস
তুমি রইলে পরবাস,
ঐ গোঁজলা কোকিল ডালে বসে
কুহু কুহু রব করে।
লাজের মামু চল না যাই ঘরে।

আজ হট্টমালার দেশে মুকুটহীন রাজা শোভান, তিন-চার জন মাতাল ওকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দেয়। বোতলের পর বোতল আসে, নিমেষে খালি হয়ে যায়। টাকা-ভর্তি গেঁজে কোমর থেকে পকেটে উঠেছে, এমনি সময় জয়নাল শোভানকে নিয়ে টলতে টলতে বাইরে এসে বড় রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করে। বাজার ছেড়ে পুব

দিকের পথ ধরে চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শোভান, তারপর জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় চলেছ দোস্ত। এত বাড়ীর পথ নয়! জয়নাল শোভানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলে—রেয়াজুদ্দীনের গলি। নেশা ছুটে যায় শোভানের—সভয়ে বলে—মাফ করো দোস্ত! ও-সব খুন-খারাবির মধ্যে আমি নেই। রেয়াজুদ্দীনের গলিতে কোনও দিন না ঢুকলেও—ওর ভয়াবহ ইতিহাস সুদূর পাড়াগাঁয়ে বসেও শোভানের অজানা ছিল না। বুক চাপড়ে অভয় দেয় জয়নাল, বলে—এই জয়নাল মিঞা যতক্ষণ সঙ্গে আছে তোমার গায়ে আঁচড়টা লাগতে দেবে না। দ্বিধা তবুও যায় না। শোভান বলে—এতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে ওরকম পাড়ায়—মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জয়নাল বলে—কোনও ভয় নেই। জয়নাল মিঞাকে চেনে না এমন ব্যাটা-বিটি রেয়াজুদ্দীনের গলিতে কমই আছে, চলে এস দোস্ত, রাত হয়ে যাচ্ছে। দুই বন্ধু চলতে শুরু করে।

রেয়াজুদ্দীনের গলির চেহারাটাই পালটে গেছে—দিনের ঘুমিয়ে-থাকা নিরীহ গ্রাম—হঠাৎ জেগে উঠে হৈ-হল্লা শুরু করে দিয়েছে। শোভানের মনে হয় যেন বড় একটা হাটের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। গলির অপরিসর বারান্দায় হরেক রকম চাটের দোকান, পান-বিড়ির দোকান এসব তো আছেই, আবার ওরই মধ্যে চিড়িয়াখানার মেয়েগুলো অপরূপ সাজে প্রকাশ্য বারান্দায় বসে বা দাঁড়িয়ে খদ্দেরের সঙ্গে দর-দাম শুরু করে দিয়েছে। অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শোভান—জয়নাল টানতে টানতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলে।

হঠাৎ ডান দিকের একটা জানালার দিকে চেয়ে চিৎকার করে ওঠে শোভান—রাঙাবৌ! তারপর এক লাফে দাওয়া ছাড়িয়ে

ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হতবুদ্ধি জয়নাল কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ; তারপর আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারে না লক্ষ্মী। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে পাগলের মত ছুটে এসে শোভানের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে আকুল ভাবে কেঁদে ওঠে—ওগো তুমি এসেছ? আজ একটা বছর আমি শুধু তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। এখুনি আমায় এ নরক থেকে নিয়ে চল। মারো-কাটো যা খুশী তোমাদের কোরো—কথাটি কইব না।

নেশা অনেক আগেই কেটে গেছে শোভানের, দু'হাতে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কেনো যে মরতে সেদিন তোর গায়ে হাত দিয়েছিলাম রাঙাবৌ, তারপর কত জায়গায় যে তোকে খুঁজেছি'। লক্ষ্মীর জল-ভরা মুখখানা বুকে টেনে নেয় শোভান, তারপর বলতে থাকে—'আজ ছ'মাস হল মা কলেরায় মারা গেছে, বোনটাও শ্বশুর-বাড়ী চলে গেছে—আর তোকে গঞ্জনা সইতে হবে না রাঙাবৌ!'

ঐ ভাবে মুখ গুঁজে লক্ষ্মী বলে, 'তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন?' শোভান হেসে বলে, 'মা-বোন পাড়া-পড়শীরা অনেক চেষ্টা করেছিল রে রাঙাবৌ—আমি কিন্তু—' কথা শেষ করতে পারে না—জম-জমাট সুরের মাঝখানে হঠাৎ তার কেটে যায়। মতির মার বাজখাঁই গলা শোনা গেল—'বলি হালা লক্ষ্মী! ঢং করে এখানে বসে আছিস, আর ওঘরে ওসমান সাহেব যে তোর পিত্যেশে বসে আছে, সে খেয়াল আছে?'

গর্জন করে ওঠে শোভান, 'কে লক্ষ্মী! এ তো আমার বৌ ফতিমা!' 'ওঃ, হুজুরের বৌ ফতিমা? বাঁদীর গোস্তাকি মাফ করবেন হুজুর। দয়া করে একবার বাইরে এসে খোঁজ নিয়ে দেখুন—এই রেয়াজুদ্দীন গলির অন্ততঃ একশো জন দিব্যি গেলে বলবে,

এ তাদের বৌ লক্ষ্মী।' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলে মতির মা।

রাগে দিগ্‌-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শোভান। উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'খবরদার মাগী! ফের ওই কথা বলবি তো জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।' ততক্ষণে বাইরের ঘরে বেশ ভিড় জমে গেছে—হেড কোয়ার্টার্সের সব মেয়ে-পুরুষ মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে চার পাশে।

মতির মা রাগে না—ভয় পাওয়ার ভান করে বলে—'বেশ, না হয় মেনেই নিলাম হজুরের বৌ ফতিমা। কিন্তু হুজুর, এত দিন যে খাওয়ালাম, পরালাম, তার দাম'—কথা শেষ হবার আগেই পকেট থেকে টাকার গেঁজেটা টেনে বার করে শোভান। তার পর সেটা মতির মার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'টাকা? টাকার ভয় দেখাচ্ছ তুমি?' চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোয় শোভানের। নিচু হয়ে গেঁজেটা তুলে নেয় নি মতির মা—তার পর নির্লিপ্ত ভাবে সেটা পেট-কোমরে গুঁজে রেখে ছায়।

শোভান এই অবসরে লক্ষ্মীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। নিস্তব্ধ ঘরে বজ্রপাতের মত মতির মার গলা শোনা যায়—দাঁড়াও! সে আদেশ অবহেলা করার শক্তি শোভানের ছিল না—অবাক্ হয়ে ফিরে দাঁড়ায়।

মতির মা বলে, 'মাস তিনেক আগে ওর অসুখে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেছে আমার—তার কি হবে?'

হঠাৎ জবাব খুঁজে পায় না শোভান—একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'কত টাকা বলো, কাল এসে দিয়ে যাব।'

'তাহলে কাল টাকা দিয়ে বৌকে নিয়ে যেও' কঠিন স্বরে বলে মতির মা।

—না ওঁকে আমি এখুনি নিয়ে যাব, তোমাদের যা খুশি করতে পার !—বলে আবার যাবার উদ্যোগ করে শোভান।

নিমেষে সরে গিয়ে শোভানের পথ আগলে হুঙ্কার ছাড়ে মতির মা—নেলো! বোধ হয় ভেতরের উঠোনে ছিল, দু' হাতে ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায় নেলো। কেলোও কাছে ছিল—যমদূতের মত নিমেষে মতির মার পাশে এসে দাঁড়ালো। হতভম্ব শোভান ফ্যাল-ফ্যাল করে চার দিকে চেয়ে জয়নালকে খোঁজে—কোথায় জয়নাল! বেগতিক বুঝে আগেই সে সরে পড়েছে।

মতির মা ইশারা করে নেলোকে, এগিয়ে এসে নেলো শোভানের হাত ধরে টান দ্যায়। লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুঁষি মারে শোভান নেলোর নাকের ওপর—রক্তে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি ভিজে লাল হয় যায়। এক হাতে তেমনি শোভানকে ধরে থাকে নেলো। অন্য হাত দিয়ে লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে ফলা-মোড়া ছুরিখানা বার করে দাঁত দিয়ে ফলা ছাড়িয়ে নিয়ে মুঠো করে ধরে। ঘরের অল্প আলোতেও নেলোর রক্তলোলুপ ছুরির ফলাটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

আর্তনাদ করে মতির মার পায়ের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে লক্ষ্মী। মা, মা গো, ওকে প্রাণে মেরো না মা, আর আমি কোথাও যেতে চাইব না। তুমি যা বলবে তাই শুনবো—মা! মা গো!

মা? বোধ হয় এক লহমার জন্য কেমন উন্মনা হয়ে যায় মতির মা, মনে হয় পায়ের ওপর পড়ে কাঁদছে লক্ষ্মী নয়,—ওরই বহুদিন হারিয়ে যাওয়া মেয়ে মতি—মুহূর্তে আবার চোখ-মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, নেলোর দিকে হাত বাড়িয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকে,—নেলো! তখনও নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, ইতস্ততঃ করে নেলো,

আর একটা ডাক ছায় মতির মা—নেলো! ঘর-সুদ্ধ ভয়ে চুপ করে থাকে, সে ডাক বা আদেশ অমান্য করবার সাহস নেলোর হয় না। অনিচ্ছায় মুষ্টিবদ্ধ ছুরিটা মতির মার হাতে তুলে ছায়। ফলাটা মুড়ে শোভানের টাকার গেঁজের সঙ্গে ট্যাঁকে গুঁজে রাখে মতির মা—তার পর নেলোকে উদ্দেশ করে বলে, মোড়ের দোকান থেকে চার বোতল ভাল বিলিতী হুইস্কি—আর পানের দোকান থেকে এক ডজন সোডা এনে ওসমান সাহেবের ঘরে দিয়ে আয়। নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে আদ্দির জামার হাতায় নাকের রক্ত মুছে বেরিয়ে যায় নেলো।

কেলোর দিকে ফিরে হাত দিয়ে শোভানকে দেখিয়ে হুকুম করে মতির মা, 'যা গলি পার করে বড় রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে আয় এটাকে,—দেখিস, প্রাণে মারিস না। কিং-কং এর মত একখানা প্রকাণ্ড লোমশ হাত নিমেষে শোভানের পিঠে পড়ে, তার পর গলার পিছন দিকের সার্টটা মুঠো করে ধরে শূন্যে উঁচু করে তোলে, হতবুদ্ধি শোভান ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার আগেই কেলো নেংটি ইঁদুরের মত শোভানকে উঁচু করে ঘরের বাইরে চলে আসে। হাত-পা ছুঁড়ে দু'-একবার প্রতিবাদের চেষ্টা করে শোভান, বুঝতে পারে কোনও ফল হবে না।

ঐ ভাবেই শোভানকে নিয়ে রেয়াজুদ্দীনের গলির ভিড় ঠেলে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলে কেলো। দু'-একজন চেয়ে ছাখে মাত্র —অবাক্ হয়ে থমকেও দাঁড়ায় না কেউ, জিজ্ঞাসাও করে না— ব্যাপার কি! শুধু চিড়িয়াখানার মেয়েগুলো এই অপরূপ দৃশ্য দেখে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে।

কিছু দূর গিয়ে গলি শেষ হয়ে যায়, সামনে বড় রাস্তার মোড়টা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—মনে হয় শিকারের আশায় বিরাটকায়

অক্টোপাশ আশে-পাশে ঠ্যাং বাড়িয়ে হাঁ করে বসে আছে। একটু দাঁড়িয়ে হাতখানা দু-একবার দুলিয়ে নিয়ে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় কেলো—শোভানকে অক্টোপাশের বিরাট মুখের মধ্যে। অসীম অতল সমুদ্রে ছুঁড়ে-ফেলা একটা ছোট্ট ঢিলের মত নিমেষে কোথায় তলিয়ে যায় শোভান।

অক্টোপাশের হা কিন্তু তবুও বোজে না—মুখ-ব্যাদান করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকে আরও নতুন শিকারের আশায়। রেয়াজুদ্দীন গলিতে তখন রাতের মাতামাতি পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে।

শেষের দিক

ঠেলা গাড়ীর মত ঠেলতে ঠেলতে জীবনটাকে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি, যেখান থেকে আর মোড় ঘোরান যায় না। পথ এতই সঙ্কীর্ণ। এখান থেকে আমি এগুতেও পাচ্ছি না, পিছুতেও পাচ্ছি না। কি ভীষণ অবস্থা!

তাই ব'লে কারও কাছে সহানুভূতি বা করুণা আমি চাচ্ছিনে। জীবনের সেই অল্প কটা দিনের ভেতর যে পাপরাশি সঞ্চয় করে বসেছি, যদি তার কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় সেই দুরাশায় আজ এ কাহিনী লিখতে বসেছি।......

আমি কুলীর সর্দার। খিদিরপুর ডকে কুলীদের মাল ওঠান নামান'র হিসেব রাখি। বেলা দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ, মাইনে পাই পঁচিশ টাকা। অবশ্য নির্বোধ কুলীগুলোর মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পয়সা থেকে ভাগ বসিয়ে আমি গড়েসড়ে পঞ্চাশ পুরিয়ে নিতে কসুর করতুম না। আর না নিয়েই বা করি কি—আমারও ত' চলা চাই!

এই 'চলা চাই' কথাটা শুনেই হয়তো অনেক হৃদয়বান লোক আমার পরিবার সংখ্যা হিসেব করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে শুরু করে দেবেন। তাই প্রথমেই বলে রাখা ভাল, পরিবারের ভেতর আমি আর আমার যুবতী স্ত্রী।

যেমন করেই হোক আমার দিনটা একরকম চলেই যায়। কিন্তু সে বেচারী মাসের মধ্যে দশ পনেরো দিন, কি তারো বেশী দিন, গোপনে উপোস দিয়ে কাটায়। কি করবো চলে না যে।

অনেকে—এই যাঁরা একটু আগে আমার উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছিলেন,—হয়ত আঁতকে উঠেছেন। আর উঠবারই ত কথা। তবে ?

সেই কথাইত' আজ বলতে বসেছি। ঐ খিদিরপুরেই একখানা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে দু'জনে বাস করতুম। ভাড়া দিতে হ'ত মাসে সাড়ে ছ' টাকা। পল্লীটা যে মোটেই ভদ্রলোকের উপযুক্ত নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। তবুও কেন যে যুবতী স্ত্রী নিয়ে সেখানে থাকতুম তার একটা কৈফিয়তও আমি ঠিক করে রেখেছি। ডকে অষ্ট প্রহর আমায় যে সংসর্গে থাকতে হ'ত তা'ত আগেই বলেছি। বাড়ীতে এসে আবার তাদের পারিবারিক মধুর আলাপগুলো না শুনতে পেলে মনটা কেমন ভাল ঠেকত না। এতই ভালবাসতুম তাদের! যাকগে, যা বলছিলাম বলি।

সেদিন শনিবার। ঘুম থেকে উঠতেই দেখি আটটা বেজে গেছে। বাসার কাছে একটা সুরকীর কলে বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছিল। সেই জন্তেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলুম। আর উঠবার আরও একটা কারণ ছিল। সেদিন মাইনে পাবার দিন। বিছানায় বসেই ডাকলুম—আবাগী! এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার—নামটা আমার স্ত্রীর। অবশ্যি ওটা আমারই দেওয়া, তার আসল নাম আভাময়ী। হাসি পেত তখন আমার। আমার স্ত্রীর নাম হ'ল কিনা—

কোন সাড়া পেলুম না। বোধ হয় রান্না ঘরে গোমাই দিচ্ছিল। তার আবার হিন্দুয়ানীটুকু ষোল আনা ছিল কিনা। এবার যে সব বিশেষণগুলো দিয়ে ডাকলুম সেগুলো যে আমার প্রতিবেশী ঐ কুলীদের মুখে ছাড়া ভদ্রলোকের মুখে মোটেই আসা উচিত নয়, এই সহজ কথাটা তখন না বুঝলেও এখন হাড়ে হাড়ে বুঝি। ঐ যা।

আবার ভদ্রলোক। আমি আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিচ্ছি। কি দুঃসাহস আমার!……আস্তে আস্তে দরজার সামনে এসে সে বল্লে—আমায় ডাকছিলে?

—না, তোমায় ডাকব কেন—পঞ্চাশ জন ঝি চাকর রয়েছে, তাদের ডাকছি। বেহায়া—নচ্ছার কোথাকার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গালাগালগুলো তার একরকম সয়ে গিয়েছিল।

বললুম—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? আজকে কাজে যেতে হবে সে হুঁস্ আছে?

ভয়ে ভয়ে সে বল্লে—আজত' ঘরে চাল নেই।……

বোধ হয় আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল যে চুলের মুঠো ধরে আচ্ছা দু'ঘা দিয়ে দিই। আবার ভাবলুম, ওত রোজই আছে।

উঠে একলাফে আলমারীটার ওপর থেকে ইস্ত্রি করা সার্টটা গায়ে দিলুম, তারপর জুতোটা কোন মতে পরে তাকে এক রকম ঠেলে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা আধুলি রয়েছে। একটা খাবারের দোকান থেকে আনা পাঁচেকের খাবার খেয়ে ডকের দিকে রওনা হলুম। কি করি না খেয়েই বা বাঁচি কেমন করে।

২

বিকেলের দিকে ডক থেকে বেরুতেই রাখাল ধরে বসল—তারপর আজ খাওয়াচ্ছ ত?

মনটা মোটেই ভাল ছিল না। আহা হাজার হ'ক স্ত্রী ত।

বেচারী সারাদিন না খেয়ে রয়েছে আর আমি কিনা···বল্লুম—না ভাই আজ আর ও ছাই-পাঁশ খাব না। বউটা······।

বাধা দিয়ে রাখাল বল্লে—ও হো হো, বউ রাগ করবে এই ত ? তা দাদা তুমি সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যাও, কি জানি রাত্রি হলে হয়তো বা শ্রীহাতের মার পর্যন্ত খেতে হ'বে।

কথাগুলোয় যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ লুকোনো ছিল তা বুঝতে আমার বাকি রইলো না। বল্লুম—কি ! তোরা আমায় এতই অপদার্থ স্ত্রৈণ ঠাওরাস্ ? চল কোথায় যাবি।

আহ্লাদে আমায় এক রকম পাঁজা করে ধরে রাখাল বলে উঠল—আরে এই ত' মানুষের মত কথা। জানিস ভাই আমার গিন্নীর একবার শখ হয়েছিল নিজে হাতে করে খরচ করবে। বলে কিনা চল্লিশ টাকায় আবার নাকি দুটো পেট চলে না। কি আস্পর্ধা বলতো ভাই ? মারলুম মুখে এক লাথি। গল্ গল্ করে রক্ত ·····

এই রকম আবোল-তাবোল কত কি সে বলে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু মোটেই শুনতে ভাল লাগছিল না। ওস্তাদিতে তখনও তার সমান হতে পারিনি। সে ছিল আমার গুরু। নিজের বংশ পরিচয়টা দিয়ে মরা মা বাপের মুখে চুন কালিটে আর নাইবা দিলুম। কিন্তু তবুও যেন মাঝে মাঝে কেমন মনে হত। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যে। সংসর্গ নৌকোর হালের মত সব দিকেই আমায় বেঁধে রেখেছিল, একটুও তাদের নির্দিষ্ট পথের সীমা পেরিয়ে যাবার যো ছিল না।······রাত্রি যে তখন কত, সে হুঁস নেই। বোতলের পর বোতল শুধু গিলেই চলেছি। একলা ঘরে সারাদিন না খেয়ে বউটা যে আমারই আশা পথ চেয়ে বসে আছে, সে কথা ভুলেও মনে এল না। আর আসবেই বা কেমন করে, আমি ত তখন দুঃখ হাহাকারে ভরা এই পৃথিবীর অধিবাসী নই। আমি তখন হুরীর

রাজ্যে। সেখানে শুধু নাচ—গান—স্ফূর্তি। তার শেষ নেই—বিরাম নেই, এমনি মজার।

রাখাল বার দুই বোতলটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু পারেনি। কথা জড়িয়ে আসছিল, ডাকলুম—মানদা! হারামজাদী। পকেটে হাত দিচ্ছিস্ যে? চুরি?······সে পেত্নীটা বোধ হয় তা'র বয়সে কখনো অত মদ খায়নি! অবশ্যি তখন তাকে পেত্নী বলে মনে হয়নি। তখন সে ছিল হুরীর মত সুন্দরী······। যাক সে কথায়।

মাগী তখন অজ্ঞানের ভান করে পড়ে রইল। সাড়া দিলে না। তারপর চোখের সামনে যেন একটা কাল রঙের পরদা ঘনিয়ে আসতে লাগল। মাথার ভেতর যেন একসঙ্গে হাজার ভূত প্রেত তাণ্ডব নাচ জুড়ে দিলে···। আর কিছু মনে নেই।

বোধ হয় তখন অনেক রাত। চোখ চাইতে গেলুম, পারলুম না। নেশার ঘোরটা তখনও কাটেনি কিনা! কিন্তু তারই ভেতর বেশ অনুভব কচ্ছিলুম দু'টো উদ্বেগ ব্যাকুল সজল কালো চোখের পলকহীন চাউনি আমায় ঘিরে রয়েছে। আরও বেশ বুঝতে পারলুম, সে চাউনি মানদার নয়।

কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল তবুও বল্লুম, আজ সারাদিন খাওনি ত?

কোন উত্তর না দিয়ে—পাখাখানা দিয়ে সে শুধু হাওয়া কত্তে লাগল। আর বললেই বা কি—সব ত' আমি জানি। একটু চুপ করে থেকে বললুম—আচ্ছা আমি কেমন করে বাড়ী এলুম বলতে পার?

সে বল্লে—ঘণ্টা তিনেক আগে নবাব একটা ভাড়া গাড়ী করে তোমায় দিয়ে গিয়েছিল। আমি ত ভেবেই সারা।

নবাব, ডকের একটা মুসলমান কুলীর নাম, আমার প্রতিবেশী।

মনে মনে ভাবলুম, সে ব্যাটা আবার সেখানে জুটল কেমন করে? আবার তখনই মনে পড়ল সেও সেদিন মাইনে পেয়েছে—কেমন একটা ধিক্কার মনের মধ্যে ঠেলে উঠতে লাগল। হায়রে মাতালেরও আবার আত্মসম্মান বোধ থাকে!

মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম কচ্ছিল। বোধ হয় সে তা বুঝতে পেরেছিল। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা নরম হাতখানা কপালটার ওপর বুলিয়ে দিতে লাগল। আঃ বাঁচলুম। সব জ্বালা যেন ব্লটিং কাগজের মত সে তা'র হাত দিয়ে শুষে নিচ্ছিল। ঘুমিয়ে বাঁচলুম।

কি কারণে জানিনে খানিক বাদে আবার চট্ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি সে ঠায় তেমনি বসে আছে। ধ্রুবতারার মত তা'র স্নিগ্ধ দৃষ্টিটা আমারই মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।

ডাকলুম—আভা!

কেমন চমকে উঠল। বিয়ের পর এই দীর্ঘ পাঁচ বছরের ভেতর তাকে ও-নামে আর কোনদিন ডাকিনি কিনা। উত্তর দিলে না। শুধু দু'ফোঁটা তপ্ত চোখের জল আমার বুকের মাঝ-খানটায় পড়ে সেখানটা যেন পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

কাঁদছিল, একটুখানি বাদে রুদ্ধ কান্নার বেগটা কোনমতে থামিয়ে ধরা গলায় বললে—আমার একটা কথা রাখবে তুমি?

বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললুম—বল।

—এবার থেকে আর তুমি ডকের কাজে যেও না। তার চাইতে ভিক্ষে করে খাব—সেও শান্তির। ভদ্রলোকের ছেলের কখনো ওকাজ সাজে? ঐসব ছোট লোকের সঙ্গে রাত দিন মিশে তুমি যেন কি হয়ে যাচ্ছ।......

সব জানতুম কিন্তু পেরে উঠতুম না। ঐসব অশ্রাব্য বকাবকি

ঠাট্টা তামাসা—ঐ সবই যেন ভাল লাগত। নরকের কেমন একটা উৎকট নেশা আমায় ঘিরে রেখেছিল। এক একবার মনে হত যে এর চাইতে রাস্তার ফেরিওলার স্বাধীন জীবন ঢের সুখের—ঢের শান্তির—কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

অনেকে হয়তো এতক্ষণ বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন—যে মাতালের এত টানা টানা স্পষ্ট জ্ঞানের কথা, সে আবার মাতাল কোথায় ?

আহা তখন কি আর এ সমস্ত বুঝতুম, না ওসব চিন্তা করে খুঁটিয়ে দেখতুম ছাই ? তা হ'লেও ত' সব গোল চুকেই যেত। আজ সুদূর অতীতের সেই সব তলিয়ে-যাওয়া ঘটনাগুলো নূতন করে বায়স্কোপের ছবির মতন চোখের সামনে ভেসে উঠছে কিনা! তাই আজ সেই আবাগীকে আবার নূতন চোখে বিশ্লেষণ করতে বসেছি। তখন তা'র পতিপ্রেমে উজ্জ্বল নির্মল আত্মাটার দিকে একবার ফিরেও তাকাইনি। তাকাবার অবসরও পাই নি। তাই আজ তা'র সব দোষগুলো গুণের আকার ধরে আমায় বিদ্রূপ কচ্ছে। যাক। বললুম—আচ্ছা এবার চেষ্টা করে দেখবো।

সে বেশ বুঝতে পাল্লে—সে কথায় না আছে প্রাণ, না আছে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

৩

তার দুদিন পরের কথা বলছি। টিপ্ টিপ্ করে বিষ্টি হচ্ছিল, উঠি উঠি করেও উঠতে পাচ্ছিলুম না—জেগে শুয়েছিলুম। সে এসে বললে—আজত' তোমার কাজের তাড়া নেই ? বাদলার ভিজে রোদের মত মুখখানা বিশ্বাসের আনন্দে উজ্জ্বল দীপ্ত।

বেশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললুম—তার মানে ?

নিমেষে মুখখানা তা'র শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বল্লে—তুমি বলেছিলে কিনা আর ডকে কাজ····· ।

বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললুম—তবে কি তুমি রোজগার করে খাওয়াবে নাকি ?

আর তার সঙ্গে এমন একটা কথা বলে বসলুম—যা তখন সহজে মুখ দিয়ে বেরুলেও আজ কিন্তু কলমে আটকাচ্ছে। দরজাটা ধরে সে দাঁড়াল, বোধ হয় নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। বেচারী সেই রাত্রের কথাটাকে বিশ্বাস করে পরম নিশ্চিন্ত ছিল। অবলা কিনা!

শিয়রে মাথার কাছে সার্টটা দলা সলা হয়ে ছিল। তুলে পকেটে হাত দিয়ে দেখি—কিছু নেই। উঠে তার চুলের মুঠো ধরে ছুটো হেঁচ্‌কা দিয়ে বল্‌লুম—হারামজাদী টাকা নিয়ে কোথা রেখেছিস্ বল্। তাইত বলি মাসের মধ্যে পনের দিন খেতে পায় না, অথচ এত খাটে কেমন করে ?

রক্তলোলুপ বাঘের সামনে ভীতা হরিণীর মত সে শুধু চেয়েই রইল। সে চাউনি যে কতখানি স্পষ্ট কলঙ্ক-লেশশূন্য তা তখন চোখের সামনে দেখেও বুঝতে পারলুম না, কিন্তু আজ না দেখেও বুঝতে পাচ্ছি। যাক একটা লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলুম।

ক্ষণিকের জন্য একবার মানদার কথাটা মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে তখনই মিলিয়ে গেল। না না সেও কি সম্ভব ? মনটা কিন্তু খুব দমে গেল। মাসের প্রথমেই কুড়ি কুড়িটে টাকা উধাও! দেখি সে তেমনি মাটিতে পড়ে আছে। বললুম—ঢের হয়েছে ওসব ঢংএ ভোলবার ছেলে আমি নই। এখন ভাল চাস ত' টাকাটা বের কর্ —আর আমায় ভাত দে। চাল নেই বললে শুন্‌ছিনে। তবু পড়ে রইলি,—দেখবি মজাটা ?

আস্তে আস্তে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, ছ' মাস পরে অন্ন পথ্য করে রোগী যেমন করে হাঁটে তেমনি করে।

খানিক বাদে যখন সত্যি সত্যি তিন চারটে তরকারি দিয়ে দাওয়ায় আমার খাবার ঠাঁই করে দিলে, তখন বাস্তবিকই অবাক্ হ'য়ে গেলুম। মুখে বললেও অন্তরে বেশ ভাল করেই জানতুম যে অত সাহস তা'র হতে পারে না। ভাত চাওয়া মানে তাকে নির্যাতন করবার আর একটা ছুঁতো। ঐ নির্যাতনেই তখন বেশ সুখ পেতুম। কিন্তু আজ একি?

বললুম—হারামজাদী! তবে না তুই……।

একটা প্রৌঢ়া গোছের স্ত্রীলোক—উঠোনের মাঝখানে এসে ডাকলে—কৈ গো মা ঠাকরুন।

সে কিছু বলবার আগেই বললুম—কেন গা! কি চাই তোমার?

কেমন জড়সড় ভাবে সে একবার আমার দিকে, একবার রান্নাঘরের দিকে, তাকাতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম—নিশ্চয়ই দুপুর বেলা ও এই মেয়ে মানুষটার সঙ্গে প্রাণের মানুষের সঙ্গে দেখাশুনো কত্তে যায়। এই ধরনের মেয়েলোকগুলো যে তাক বুঝেই আসে তা বেশ জানতুম। অন্যদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি—আজ ঠিক ধরে ফেলেছি। কেমন একটা পৈশাচিক আনন্দে মনটা ভরে উঠল!

মেয়েলোকটা বোধ হয় বুঝতে পারলে যে, ইতস্ততঃ করে আর ফল নেই, তাই বললে—'কাল সকালে মা ঠাকরুন এক গাছা বালা বিক্রি কত্তে দিয়েছিলেন। পাঁচ টাকা কালই দিয়ে গেছ্নু, বাঁকি পঁচিশ টাকা আজ দিতে এসেছি। তা ওনাকে দিলেও যা, আপনাকে দিলেও তা।' এই বলে আঁচলের খুঁট খুলে পঁচিশটে টাকা দাওয়ার ওপর রেখে দিলে। পরে একটু এদিক ওদিক চেয়ে বললে, 'মা ঠাকরুন এখন বড্ড ব্যস্ত, তা আমি অন্য এক সময় আসব'খন্।'

হতবুদ্ধি আমি ঠায় তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম—কথা বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এই একটু আগে যে মিথ্যা ব্যাপারটা নিয়ে বিয়োগান্ত একখানা নাটকের সৃষ্টি করে তুলেছিলুম—তারই সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ যে সামনেই পড়ে রয়েছে। অবিশ্বাস করি কি করে? গত ব্যাপারটার জন্যে অনুতাপ যে একটুও হচ্ছিল না, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। তা'র মুখের দিকে চাইবার সাহস হচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি ছুটো নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়লুম।

৪

সাত নম্বর ডকের চিফ্ অফিসারের কাছে 'সাইকন্‌মারু' জাহাজের লোডিং রিপোর্ট নিয়ে যাচ্ছিলুম। পেছন থেকে কে ডাকলে—দাদা খুব ব্যস্ত নাকি?

চেয়ে দেখি রাখাল। বললুম, 'কেন, কোন কথা আছে নাকি?'

আর কথা, সেদিন যে খাওয়ানটা খাইয়েছ তারই তাল সামলাতে ছুদিন লেগেছে।

মনটা কেমন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। যে ব্যাপারটা নিয়ে আজ সকালে এতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল, হতভাগাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাটাই তুললে। একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আমি ত ভাই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম—হঠাৎ যে?

—আর ভাই হঠাৎ কৈ। সেদিন ত' টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী গেলুম। তারপর মারপিট সেদিন একটু বেশী রকমই হয়ে গিয়েছিল। বউটা সেই থেকে রক্ত বমি কচ্ছে। বোধ হয় বাঁচবে না। সেই

থেকে মনে কেমন একটা ঘেন্না জন্মে গেছে। দেখলুম, রাখালের চোখ দুটো ছলছল কচ্ছে, ওর প্রত্যেক কথাটা তীরের মত গিয়ে বুকে বিঁধ্‌ছিল। মনে পড়ে এই রাখালই একটু একটু করে প্রলোভন দেখিয়ে আমায় নরকের শেষ সীমানায় দাঁড় করিয়েছে। আর আজ দিব্যি সরে দাঁড়াচ্ছে। শয়তান, চোখের জলে আজ আমায় ভুলোতে পাচ্ছিস্‌নে। কথা বলতে পাচ্ছিলুম না, রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। কি না করেছি আমি? মানুষ যত রকম পাপ করতে পারে সব। আর আজ নরক পথের সঙ্গী তুমি, তুমি আজ একলা ফেলে সরে দাঁড়াচ্ছ! বিশ্বাসঘাতক শয়তান! সে বললে— 'আর বাস্তবিক ভাই এ সব আমাদের পোষায় না।' ডাকলুম— 'রাখাল।'

'বাস্তবিক দাদা! তুমি রাগ করতে পার, তোমাকে মদ খেতে এক রকম আমিই শিখিয়েছিলুম—কিন্তু তুমিও ছেড়ে দাও না ভাই!……'

বললুম—আমি কি করব না করব সে উপদেশ ত' তোমার কাছে চাইনি। তুমি আমার সামনে থেকে যাও।

অকস্মাৎ আমার এতখানি পরিবর্তনে সে বোধ হয় বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিল। কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে অপরাধীর মত সে চলে গেল।

সে ত গেল, কিন্তু আমি আমার কাজে যেতে পারলুম না। সেইখানে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, কেন যে তার মানে নিজেই বুঝতে পাচ্ছিলুম না। রাখাল? কি দোষ তার? আমার যদি ইচ্ছে বা উৎসাহ না থাকত তবে ওর সাধ্য কি যে আমাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়! অতীতের কথাগুলো একে একে মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। মনে পড়ে,

একবার একটা গণৎকার আমাদের বাড়ীতে এসে আমার হাত দেখে বলেছিল যে, ভবিষ্যতে চরিত্রে—অর্থে—সব তাতেই আমি একজন বড় মানুষ হব। মা বাপের কি সে আনন্দ! হাসি পাচ্ছিল আমার। খোদার উপর খোদকারী করে আজ আমি ঠিক তার উল্টো পথে এসে দাঁড়িয়েছি। সে সব কথা এখন একটা জটিল দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।······

কতক্ষণ যে সেই ভাবে ছিলুম জানিনে। গোকুল এসে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—ওহে তুমি ত' দিব্যি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। ওদিকে চিফ্ অফিসার যে তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোন কথা না বলে চিফ্ অফিসারের কামরার ভেতর ঢুকলাম! সে ব্যাটা ফিরিঙ্গি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কতকগুলো যা তা বলে দিলে। কথাগুলো যে আত্মসম্মানজ্ঞানবর্জিত লোক ছাড়া কেউ সহ্য করে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিন হলে কি করতুম জানিনে। আজ কিন্তু সহ্য করতে পারলুম না। বললুম—দেখ বাবা, মা তুলে গালি দিও না বলছি, উল্লুক কোথাকার!

ব্যাটা আশা করতেই পারেনি যে পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুতে পারে। কোন কথা না বলে একটা কাগজে কি লিখে বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে একটা কুলীকে কি বলে দিলে। বললুম—'কষ্ট করে তোমায় রিপোর্ট করতে হবে না। চাকরি! চাকরি যাবার ভয় দেখাচ্ছ তুমি? রইল তোমার চাকরি', বলে কোন দিকে না চেয়েই সটান রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। কি আশ্চর্য! এই রকম একটা ছুতোই যে আজ খুঁজ-ছিলুম। অবস্থাটা তখন আমার দীর্ঘদিন কারাবাসের পর স্বাধীন আলো বাতাসের মুখ দেখা কয়েদীর মত—অপূর্ব। একটা অজানা পুলকের সাড়া আমার দেহের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

৫

ডক থেকে কখন যে গঙ্গার ধারে এসে পড়লুম জানিনে। দেখলুম রাস্তায় আলো জ্বেলে দিয়েছে। কেরানী, কুলী, মজুর সব দিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর যে যার ঘরে চলেছে—কি উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল তাদের গতিভঙ্গি! কেউ বাজার করে চলেছে, কেউবা একখানা কাপড় নিয়ে। প্রত্যেকে একটা না একটা কিছু নিয়েছেই। মনে পড়ল আমার দীর্ঘ দাসত্ব জীবনে এমন একটা দিনও নেই যেদিন এক পয়সারও জিনিস তাকে দিয়েছি। আজ জগতের সব জিনিসই যেন নূতন ঠেকতে লাগল। মনে পড়ছিল একখানা শতছিন্ন ময়লা কাপড় ছাড়া কোন দিন তাকে পরতে দেখিনি। এই রকম সব একরাশ খুঁটিনাটি ঘটনা মনের মধ্যে এসে ভিড় করছিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—ওমা, সেই পঁচিশটে টাকা! আচ্ছা, বলতো আমি কি মানুষ? মানুষ হলে কখনো সে টাকা কেউ নিতে পারে? কিন্তু কখন যে টাকাটা নিলুম মনে পড়ল না। ভাবলুম, যাক ভালই হয়েছে। আজকের দিনটে জীবনের একটা স্মরণীয় দিন করে রাখবো।

বাজারে গিয়ে তার জন্যে একখানা ভাল কাপড়, একটা সেমিজ, সাবান, তেল এই রকম সব কিনলুম। বাজার থেকে ভাল দেখে একটা মাছ, তরকারি কিনে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। রাত্রি তখন দশটা বাজে। মনে মনে ভাবলুম—আজ তাকে অবাক্ করে দেব। এক সঙ্গে এতগুলো পরিবর্তনে তার মুখটা কেমন হয়ে উঠবে, কল্পনা ক'রে বেশ একটু আনন্দ অনুভব কচ্ছিলুম—যার আস্বাদ আগে কোন দিন টের পাইনি।

বাড়ীর সামনে এসে বাইরের দরজার কড়া ধরে নাড়লুম, কোন সাড়া নেই। আবার জোরে দরজায় ধাক্কা দিলুম—সারা পল্লীটাতে

তার প্রতিধ্বনি উঠলো, তবুও তা'র দেখা নেই। মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম। এ রকম ত' কোন দিন হয় না ; এসে আস্তে কড়া ধরে নাড়তে না নাড়তেই ত' সে দরজা খুলে দেয়—আর আজ।···

দরজা খুলে গেল কিন্তু দেখলুম সে নয়—তার পরিবর্তে সেই সকাল বেলাকার মেয়েলোকটা—যে তার বালা বিক্রি ক'রে দিয়েছিল। তাকে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেলুম। দেখি সে বিছানাটার ওপর শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে।

নিমেষে সব ভুলে আবার আগেকার পশুভাব মনে জেগে উঠলো। জিনিসগুলো সব মেজেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তা'র চুলের মুঠো ধরে বললুম—নবাবের বেটি, সন্ধ্যে না হতেই ঘুম। আজ তোর একদিন

বাধা দিয়ে সেই মেয়েলোকটি বলে উঠল—আপনি কচ্ছেন কি? দেখছেন না যে মরে···আঁতকে উঠে বল্লুম—অ্যাঁ! মরে গেছে? বল কি?

চোখের সামনে পৃথিবীটা কাঁপছিল! হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে দেখলুম তাইত!

সে বলতে লাগল—বাবু! আর ঘণ্টা খানেক আগে এলেন না কেন? তা হলে মা লক্ষ্মী আমার······।

সে কেঁদে ফেললে। আমার তর সইছিল না। বললুম—কেমন করে এ সর্বনাশ হ'ল?

—তা কি জানি বাবু? দুপুরে খেয়ে দেয়ে এসে দেখি মা আমার রান্নাঘরের মেজেয় পড়ে ছটফট কচ্ছে। আমি ত' অবাক্। জিজ্ঞেস কত্তে বল্লেন—পিসি, পা পিছলে পড়ে গেছি। আহা আট মাসের

পোয়াতী। মাকে ত' ধরে এনে খাটের ওপর শুইয়ে দিলুম। সেই থেকে কেবল তোমার লেগে ছটফট কত্তে লাগল। মা আমার সতীলক্ষ্মী ছেল' বাবু। তুমি দুপুরে অফিস বেরিয়ে গেলে—মা আমার উলের কার্পেট, মোজা এই সব বুনে আমাকে দিয়ে বেচতে পাঠাত'। বলতো—পিসি! বাবুর আয় অল্প, চলে না!······

আশ্চর্য! এসব শুনেও আমি পাগল হইনি। এর চাইতে ভীষণ অবস্থা কেউ কল্পনা করতে পারে কি? শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তা'র মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কথা বলবার ক্ষমতা তখন ছিল না! কান্না? তা হলেও ত' তবুও কতকটা শান্তি পেতুম।

সে যে মরবার সময়ও আমার গায়ে এক বিন্দু কালির আঁচড় লাগতে দিলে না—এইটেই আমার সবচেয়ে বুকে বাজছে। হতভাগী! কেন তুই জগতের কাছে আমার মুখোসটা ভাল করে খুলে দিলি নে! এ তুই আমার কি সর্বনাশ করে গেলি।

একমাত্র আমিই যে তার মৃত্যুর কারণ এই নিছক সত্য কথাটা এক আমি ছাড়া আজ আর কেউ জানলে না। ভগবানকে সাক্ষী মানব না, কেন না আমার মত নারকীর মুখে সে নাম বিদ্রূপের মত শোনাবে।

তা'র বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে ডাকলুম—আবাগী! আভারে! একবার চেয়ে দেখ তোর জন্যে আজ আমি সব ছেড়ে নতুন মানুষ হয়ে এসেছি। তবুও অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে রইলি? লক্ষ্মীটি আমার! আর কখনো তোকে মারবো না। এবার ভিক্ষে করেও তোকে খাওয়াব—আর উপোস দিয়ে থাকতে দেবো না।

কে সাড়া দেবে! কঠিন বিদ্রূপের মত কথাগুলো ঘরের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আবার আমার কানেই ফিরে এল।

সকল দুখের প্রদীপ

জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে বারো আনা লোক, সেই সময়ের কথা বলছি। আমাদের বাড়ীটাও জনশূন্য, একা আমি প্রেতের মত বাড়ী আগলে পড়ে আছি—সারা পাড়াটা নিঝুম খাঁ খাঁ করছে। স্টুডিওর কাজ-কর্ম সব একরকম বন্ধ বললেই হয়, বহু আর্টিস্ট কলকাতার বাইরে। দুপুর বেলাটা কাটানোই সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে—ঘুমিয়ে, বই পড়ে, বারান্দায় ছাতে পায়চারি করে সময় আর কাটতে চায় না, এমনি একদিন দুপুর বেলায় শুয়ে ঘুমোবার আয়োজন করছি, কানে ভেসে এল—বাঁশের বাঁশি,

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে,
দিবস গেলে কোরবো নিবেদন।
আমার ব্যথার পূজা
হয়নি সমাপন।

ভীতা ত্রস্তা জনশূন্য কলিকাতা নগরীতে দিবা অবসানের অপেক্ষা না করেই ঠিক দুপুরে কে কাকে ব্যথার নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করতে বসেছে। কৌতূহল হল, দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম ; যতদূর দেখা যায় শুধু ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে খালি বাড়ীগুলো খাঁ খাঁ করছে। বাঁশি বেজেই চলেছে এবার বেশ স্পষ্ট। ছাতে উঠলাম। প্রথমে কাউকে দেখতে পেলাম না, প্রচণ্ড রোদে চোখ ঝলসে যায়, একটু পরে চোখ দুটো দূরবীণের মত তীক্ষ্ণ করে দেখলাম দূরে ; বেশ খানিকটা দূরে উত্তর দিকে একটা তিনতলা

ছাতে আলসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে একটি বছর বাইশ তেইশের যুবা আড় বাঁশিতে দুখের প্রদীপ জ্বেলে ব্যথার পূজা শুরু করে দিয়েছে। চোখ আরও একটু অভ্যস্ত হয়ে এলে দেখলাম, ছেলেটি রোগা, গৌরবর্ণ, মাথায় এক রাশ রুক্ষ বাবরি চুল। এক কথায় যে ধরনের চেহারা দেখলে অধিকাংশ ব্যাটা ছেলের গা জ্বলে যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েরা পছন্দ করে। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠলাম, আমাদের ঠিক সামনের বাড়ী, যার জানালা দরজা প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকতো, ওপরের একটি ঘরের দরজা খুলে সন্তর্পণে সেটি ভেজিয়ে দিয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে সামনের খোলা ছাতে এসে দাঁড়াল একটি অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণী। পাছে ওদের পূজার ব্যাঘাত হয়, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে তিনতলার ছোট্ট কুঠুরীতে ঢুকে ঐ দিকের জানালাটা হঠাৎ খুলে চেয়ে রইলাম। দেখলাম তরুণীটি এসে দাঁড়াতেই বাঁশি থেমে গেল, বাঁশি হাতে আলসের ওপর থেকে নেমে তরুণটি ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তরুণীকে কি যেন ইশারা করলো। তরুণীটির মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, দেখলাম সেও দু' তিন বার ঘাড় নেড়ে কি যেন সম্মতি জানালে। আর একবার চারদিক চেয়ে দেখে নিয়ে তরুণী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাঁশি হাতে তরুণও নিচে নেমে গেল। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কেন জানি না, ঐ বাঁশিওলা তরুণটির ওপর মন বিরূপ হয়ে উঠলো। কোনও সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে কারও ঘনিষ্ঠতা দেখলেই মন আমার অকারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই একটিমাত্র বদভ্যাস ছেলেবেলা থেকে আফিং-এর নেশার মতন আমায় লেপ্টে ধরে আছে, অনেক চেষ্টা করেও মনটাকে উদার করতে পারি না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কথাই ভাবছিলাম, দেখি তরুণীটি

সেজে গুজে ছোট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে চলেছে, কোথায় চলেছে না জানলেও কার সঙ্গে দেখা করতে চলেছে বুঝতে দেরি হল না। একবার ভাবলুম, ফলো কোরবো? তখনি ভাবলাম লাভ হবে না, ওরা আমাকে চিনে ফেলবে। অনেক কষ্টে ওদের পেছু নেওয়ার ইচ্ছা দমন করলাম।

এরপর কয়েকদিন নিঝুম চুপচাপ কাটলো, ছাতে বারান্দায় দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেও তরুণ তরুণী বা বাঁশের বাঁশির সাড়া পেলাম না। ভাবলাম সেদিন আমায় দেখতে পেয়ে ওরা কি সাবধান হয়ে গেল? না বাঁশির ইশারায় ওরা কলকাতা ছেড়ে দূরে বহু দূরে লোক চক্ষুর অন্তরালে পূজা সমাপন করতে চলে গেল। যেখানেই যাক ওরা আমার মনের সুখ শান্তি বেশ কিছু দিনের জন্য লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল, একথা অস্বীকার করতে পারবো না। পাশের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ভদ্রলোকের নাম অভয়বাবু, সায়েটিকা বাতে শয্যাশায়ী, মেয়ে অচলা, আশুতোষ কলেজে আই-এ পড়ে। এ ছাড়া অভয়বাবুর এক বিধবা বোন ও একটি চাকর নিচের তলায় থাকে। অভয়বাবুর তুই ছেলে আফিস থেকে ছুটি নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ পালিয়ে গেছে দেশের বাড়ীতে, বোমার ভয়ে। অচলাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তারা অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল, অভয়বাবুও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু ফল হয়নি, মেয়ে গোঁ ধরে বসলো, বাবার সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি হবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ীটার দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, বন্ধু অনাদি এসে হাজির। কী ব্যাপার! অনাদি বললে, বাড়ীর ভেতর চুপ করে বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি, চ'ল না মেট্রোর ছবিটা দেখে আসি, খুব ভাল ছবি। তুটো বেজে গিয়েছিল, তখনই রওনা হয়ে পড়লাম।

ইন্‌টারভ্যালের পর সবে ছবিটা আরম্ভ হয়েছে, গেট কীপার টর্চ জ্বেলে একটি ছেলে ও মেয়েকে ঠিক আমার সামনের সিট দুটোতে বসবার নির্দেশ জানিয়ে দিল। নির্দিষ্ট সিটে বসবার আগে মেয়েটিকে চিনলাম—অচলা, পুরুষটিকে ভাল করে না দেখেও চিনলাম ও বুঝলাম প্রদীপকুমার। মনটা দু' ভাগ হয়ে গেল। ভাল ছবি বলে অর্ধেক মন পর্দার ওপর আপনিই চলে যাচ্ছিল, বাকি অর্ধেকটা ওদের দুটিকে কেন্দ্র করে শিকারী বিড়ালের মত সজাগ হয়ে রইল। খানিকটা সময় চুপচাপ কাটলো। হঠাৎ অচলার গলা শুনতে পেলাম, 'যদি জানতে কত কাণ্ড করে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে আমায় আসতে হয়, তাহলে কখনই দেরি করে আসার জন্য আমার ওপর রাগ করতে পারতে না।'

উত্তরটা শুনতে পেলাম অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠের একটু চাপা আওয়াজ, তুমি কি জান না রানী, এত অল্প সময় তোমায় পেয়ে আমার মন ভরে না।

—সব জানি, কিন্তু বাবার অসুখের কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

আবার কিছু সময় চুপচাপ কাটে, পর্দায় ছবিটার ওপর মন দেবার চেষ্টা করি।

চাপা গলার আওয়াজ শুনতে পাই প্রদীপকুমারের—রানী!

—কি, বল না শুনছি।

—বলছিলাম কি, চল না একদিন কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোনও ডাকবাংলোয় কাটিয়ে আসি।

প্রথমে খানিকটা খিলখিল করে হালকা হাসির আওয়াজ, তারপর মেয়েটি বলে—দিন দিন যেন কী হচ্ছ তুমি, তোমার সঙ্গে সারাদিন বাইরে কাটালে বাবাকে দেখবে কে?

বেশ একটু জোরে উৎসাহের সঙ্গে ছেলেটি বলে—কেন, তোমার পিসিমা রয়েছেন, চাকর রয়েছে, একটা দিন বইত নয়, মুখে ত খুব শুনতে পাই, তোমার জন্য বোমার ভয় তুচ্ছ করে কলকাতায় রয়ে গেছি, আসলে কিন্তু বাবা—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে—বেশ বেশ, তাই তাই, হয়েছে ত ?

বুঝলাম এবার বেশ কিছুক্ষণ চলবে মান ভাঙাভাঙির পালা, শাহেন শা ছেলে প্রদীপকুমার, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, দেখি এরই মধ্যে অচলার একখানি হাত ধরে ফেলে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে কি বললে এক বর্ণও শুনতে পেলাম না। আর একটু বাদে বাঁ হাতখানা অচলার পিঠের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে কাছে টেনে নিলে, দেখি পাশাপাশি তুটো মাথা এক হয়ে গেছে, তারপর ফিস ফিস করে তুজনের অফুরন্ত কথা। সবচেয়ে ক্ষতি হল আমার, এমন ভাল ছবিটি। অথচ না দেখতে পেলাম ভাল করে ছবিটা, না শুনতে পেলাম ওদের প্রেমালাপ।

ছবি শেষ হবার একটু আগে ওরা বেরিয়ে গেল, যাওয়াই স্বাভাবিক। ষোলো আনা ইচ্ছে থাকলেও পিছু পিছু যেতে পারলাম না। অন্ধকারে ক্ষত-বিক্ষত মনে নিষ্ফল আক্রোশে বসে ফুলতে লাগলাম।

মেট্রোর ঘটনার পর এক মাস কেটে গেছে। একটা নতুন ছবির কাজ শুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ সময় স্টুডিওতে কাটাতে হয়, কাজেই ওদের আর কোন খোঁজ খবর বিশেষ রাখতে পারিনি, তাছাড়া উৎসাহেও খানিকটা ভাঁটা পড়ে এসেছিল, হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম সানাই বাজছে সামনের বাড়ী, খবর নিয়ে শুনলাম, আজ অচলার বিয়ে, খুব তাড়াতাড়ি সব ঠিক করতে হয়েছে, অচলার বাবার অবস্থা খুব ভাল নয়। ওঁর একান্ত ইচ্ছা অচলার বিয়েটা

দিয়ে যান। দেশ থেকে অচলার ভাই ভাজেরা সব ছেলে-পিলে নিয়ে এসেছে হৈ-হল্লা চেঁচামেচিতে নিস্তব্ধ বাড়ীটা আজ সরগম। ভাবলাম, যাক প্রদীপকুমারের প্রদীপ জ্বালা এতদিনে সার্থক।

গোধুলি লগ্নে বিয়ে—সন্ধ্যার আগেই মোটরে করে বর এসে হাজির, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না—নিচে নেমে এক পা দু'পা করে মোটরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু একি! বরের টোপর পরে ত' প্রদীপকুমার নয়! বছর চুয়াল্লিশের একটি প্রৌঢ়, মাথায় মসৃণ টাক—টোপর পরে গলায় মালা দিয়ে বর বেশে বসে রয়েছে মোটরে। রীতিমত কৌতূহল হল, অতি কষ্টে খবরটা পেলাম।

বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি বা অন্তিম ইচ্ছা এসব আসল কথা নয়—খুব শীঘ্র অচলার বিয়ে দিতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে শুধু যে বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হবে তাই নয়, কেলেঙ্কারিতে সমাজে মুখ দেখানোই দায় হবে। সত্যি দুঃখ হল অঁচলার জন্য, আর তার চাইতে রাগ হল ঢের বেশী যত নষ্টের মূল ঐ অকর্মণ্য রাঙামূলো প্রদীপটার ওপর।

ছ' মাস পরের কথা বলছি। হঠাৎ পুরী যাওয়ার একটা যোগা-যোগ ঘটে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে বেডিং, সুটকেস্ নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম পুরী এক্সপ্রেসে। প্রথমেই আমার ফেভারিট হোটেলে— দোতলার পুব দিকের ঘরটা পেয়ে যাওয়াতে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠলো। দুপুরে খেয়ে দেয়ে কষে এক ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙতে দেখি হোটেলের চাকর চা-জলখাবার নিয়ে ডাকছে। উঠে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে বারান্দায় পাতা খালি তক্তাপোশটার ওপর বসলাম। পাশের ঘরটিতে কারা যেন এসেছে —পাশাপাশি দুটো বারান্দার ব্যবধান মাত্র একটা সরু ইঁটের

পাঁচিল—হাত ছয়েক লম্বা তক্তাপোশের ওপর উঠে দাঁড়ালে সব দেখা যায়। পাশের বারান্দায় বেশ ভারি পুরুষের গলা শুনতে পেলাম—'তণি, তণি!' ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের উত্তর এল —যাই বাবা! একটু পরে বারান্দায় এসে বলে— কি বলছিলে বাবা?

—বলছিলাম বেলা চারটে বেজে গেছে, তুমি এখনো বেড়াতে যাওনি মা? ডাক্তারের কথাটা সব সময় মনে রাখবে। হার্টের ট্রাবলসে একমাত্র ওষুধ হল—সমুদ্রের ধারে বেড়ান আর বুক ভরে 'ওজোন' ইনহেল করা।

'তোমরাও কেন চল না,—তুমি, মা'—আব্দারের সুরে বলে তণি। তণির মা আস্তে আস্তে কি যে বললেন বুঝতে পারলাম না, কিন্তু বাবা বেশ উঁচু গলায় বললেন—'আমাদের কথা ছেড়ে দাও মা—তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এ বয়সে আর কসরত করে কয়েকটা দিন পরমায়ু বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। তোমাদের কথা আলাদা, সাঁরা জীবনটাই পড়ে রয়েছে সামনে—কত ঝড়-ঝাপটা ঠেলে এগুতে হবে—কাজেই দেহটা মজবুত না হলে প্রতি পদে বাধা পাবে।' একটুখানি চুপচাপ, আবার শুনতে পেলাম—'ভেবে ছিলাম তো এই বৈশাখে তোর বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা বাকী জীবনটা কাশীবাস করে কাটিয়ে দেব—কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর, কোথা থেকে একটা হার্ট ট্রাবল—'

কথা শেষ হবার আগেই তণিমা বললে, 'আমি চল্‌লুম বাবা।' পরক্ষণেই সিঁড়িতে শ্লিপারের মৃদু আওয়াজে বুঝলাম তণিমা বেরিয়ে গেল। কৌতূহল বসে থাকতে দিলে না—উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে নিচের দিকে চেয়ে দাঁড়ালাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না—একটি ছিপছিপে দোহারা চেহারা মেয়ে,

রঙ বেশ ফর্সাই বলা চলে—বয়স কুড়ি একুশের বেশী নয়। এসে হোটেলের সামনের লনটায় দাঁড়িয়ে ওপরে ফিরে চাইলে, বুঝলাম এই তণিমা। সব মিলিয়ে তণিমাকে খুব সুন্দরী বলা না গেলেও একটা বিশেষ আকর্ষণ যেন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছে ওর মধ্যে, যার জন্য একবার দেখলেও দেখার ক্ষুধা মিটতে চায় না। চোখাচোখি হল তণিমার সঙ্গে। বোধ হয় চললো, চোখে মুখে তার আভাষ পেলাম না। তণিমা ওপরে রেলিং এ দাঁড়ানো বাবা মার দিকে চেয়ে হেসে হাত তুলে সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

তণিমার বাবা মাকে দেখলাম। বাবার বয়স ষাটের ওপর—মার বয়স ধরবার উপায় নেই—ষাটের কাছাকাছিও হতে পারে, আবার পনের বিশ বছর কমও হতে পারে। তুজনেই বেশ মোটা-সোটা, ভাল মানুষ টাইপের চেহারা। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই হেসে নমস্কার করে তণিমার বাবা আমায় বললেন—'আপনি এই হোটেলে এসেছেন শুনেছি; আমাদের ঠিক পাশেই বুঝতে পারি নি।' কিছু একটা বলা দরকার, প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'ঐটি বুঝি আপনার মেয়ে?' ভদ্রলোক বললেন—'হ্যাঁ ঐ সব, ছেলেমেয়ে সব মরে গিয়ে গিয়ে ঐ একটিতেই দাঁড়িয়েছে।'

আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে জানলাম, ভদ্রলোকের নাম নিবারণ বোস। রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট অফিসার। কলকাতায় শ্যামবাজারে নিজের বাড়ী গাড়ী—এক কথায় বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক। মেয়ে তণিমা—বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। বাবা মার একান্ত ইচ্ছা—মেয়েটির বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কোনও তীর্থস্থানে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া।

কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এল, কাপড়-চোপড় বদলে ঘরে তালা দিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াবার জন্য বেরুলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমেই পড়ে বারান্দা, সেখানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা; ম্যানেজার ও নিচের কয়েকজন বোর্ডার কেউ কেউ জটলা করেন। দেখা যায় ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে প্রথম চেয়ারটিতে নিয়মিত বসে রয়েছেন ব্রজদুলালবাবু। যতবার এই হোটেলে এসেছি, দেখেছি ঐ চেয়ারটায় নিয়মিত সকাল বিকাল বসে পরনিন্দা করছেন, আর পা দোলাচ্ছেন। কেন বলতে পারবো না, লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না। বাড়ী পূর্ববঙ্গে, বয়েস পঞ্চাশের মধ্যে, মোটাসোটা ভুঁড়িদার চেহারা। কলকাতায় দু'তিনখানা দোকান আছে—দেখাশুনা এখন ছেলেরাই করে, একটু ফাঁক পেলেই ব্রজদুলালবাবু পুরীতে ছুটে আসেন স্বাস্থ্যোন্নতির আশায়। কেউ কোনদিন কিন্তু ভুলেও ব্রজদুলালবাবুকে নিচে বেড়াতে বা সমুদ্রে স্নান করতে দেখেনি। সেদিনও জটলা সুরু হয়েছিল তণিমাকে নিয়ে। আমায় দেখেই সব তাড়াতাড়ি চুপ করে গেল; শুধু ব্রজদুলালবাবু ঘোড়ার মত হেঁ হেঁ হেঁ করে ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠে বললেন—হাওয়া খাইতে চল্‌লেন? বললাম—হ্যাঁ। আবার সেই হাসি, তারপর সবার দিকে চেয়ে বললেন—'একটু দেরি কইর্‌যা ফ্যাললেন, আমরা আশা কর্‌ছিলাম এক লগে ছ্যাখতে পামু।' একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললাম—'আপনি কি সব বলছেন ব্রজবাবু?' একটু থতমত খেয়ে ব্রজদুলালবাবু বললেন—'বলছিলাম —উপ্‌রের নিবারণবাবুর মাইয়্যা তণিমার কথা—তা আপনার লগে আলাপ এখনও হয় নাই?'

বেশ রাগের সঙ্গেই বললাম—না। তারপর সমুদ্রের দিকে পা বাড়ালাম।

কৃষ্ণ পক্ষ, পীচ ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাছের মানুষ চিনে নিতে কষ্ট হয়। একা একা বেশীক্ষণ বেড়াতেও ভাল লাগে না। খানিক

পায়চারি করে বালির ওপর বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে চেয়ে রইলাম। ঐ একঘেয়ে আওয়াজ আর সাদা ফেণায় ভর্তি ঢেউ, ও কিন্তু পুরানো হয় না, যতবার দেখো নতুন লাগে, ভালো লাগে, মন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে যায় অজান্তে। তন্ময় হয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠলাম, কাছে বোধ হয় পাঁচ ছ' হাত দূরে কে যেন আড় বাঁশিতে বাজাচ্ছে, সকল দুখের প্রদীপ— ভাবলাম এখানেও কি প্রদীপকুমার ধাওয়া করেছে? সন্দেহ ভঞ্জন করতে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে ঠিক পেছনে, মাত্র দু'তিন হাত ব্যবধানে এসে বসলাম। আমার অনুমানই ঠিক, কিন্তু পাশের ও মেয়েটি কে? একটু পরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম, নিবারণবাবুর মেয়ে তণিমা প্রদীপের একেবারে গা ঘেঁষে বসে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে এক মনে বাঁশি, শুনছে নয়, গিলছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠলো। একটু পরে বাঁশি থেমে গেল, বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ কাটিয়ে দিলে। তণিমাই প্রথমে কথা বলে—তোমার বাঁশিতে এই 'সকল দুখের প্রদীপ' গানটা আমার এত ভাল লাগে, মনে হয় যেন সুরের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল টপটপ করে ঝরে পড়ছে। এত মিষ্টি করে বাজাতে তুমি শিখলে কি করে?

প্রদীপ জবাব দেয়—শিখে বাজালে কসরতটাই বেশী প্রকাশ পায়, বুকের হাহাকার ফুটিয়ে তুলতে হলে চাই দরদ, ভালবাসা।

অবাক্ হয়ে বলে ওঠে তণিমা—ভালবাসা? দু'হাতে তণিমাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে নেয় প্রদীপ, তারপর গদগদভাবে বলতে থাকে—হ্যাঁ, ভালবাসা, তণিমা! আমি ত' বাহাদুরি কুড়োবার জন্যে বাজাইনে, আমি বাজাই শুধু একটি শ্রোতাকে শোনাতে, চোখ বুজে যখন বাজাই, আমার চোখের সামনে বিশ্বজগৎ লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু ধ্রুবতারার মত জেগে থাকে একখানা

মুখ, তারই উদ্দেশ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আমি বাজাই বাঁশি।

তণিমা দুষ্টুমি করে বলে—সেই মুখখানির অধিকারিণী কে, দয়া করে বলবে কি?

প্রদীপ বলে—এখনও বুঝতে পারনি দুষ্টু? আচ্ছা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এক রকম জোর করে ঠেলে ঠুলে উঠে বসে তণিমা, তারপর কপট অভিমানে বলে—যাও যাও, তোমাদের পুরুষ জাতটার শুধু মুখই সর্বস্ব, কথায় পারবার জো নেই।

প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে প্রদীপ বলে ওঠে—তুমি! তুমি এই কথা বলছো তণি? তুমি কি জান না, তোমার জন্যে আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই। তুমি একবারটি বল, আমি এখুনিই এই অন্ধকারে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিন চার পা এগিয়ে যায় প্রদীপ, আর্তনাদ করে ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে বলে তণিমা—কি সব ছেলেমানুষী হচ্ছে? আমি কোনওদিন তোমার ভালবাসায় সন্দেহ করেছি?

যেন অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রদীপ, তারপর তণিমার হাত ধরে বলে—চলো খানিকটা বেড়িয়ে আসি। তণিমা বলে—আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, বাবা মা ভাবছেন, আজ চলি, হ্যাঁ? উত্তরের অপেক্ষা না করেই হোটেলের পথ ধরে তণিমা, প্রদীপ চিৎকার করে বলে—কাল সকালে খুব রাত থাকতে, চক্রতীর্থে, মনে আছে ত?

উত্তরে তণিমার কথা শোনা যায় না হাওয়ার জন্য, শুধু ঘাড় নাড়া দেখে বোঝা যায় তার মনে আছে। একটু পরে প্রদীপও চলে যায় উল্টো দিকে। শুধু উত্থানশক্তি রহিত হয়ে বসে থাকি

আমি। রাগ হয় তণিমার ওপর, আজ প্রদীপকে জব্দ করবার এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়েও নষ্ট করে দিল প্যানপেনে মেয়েটা।

চারদিক চেয়ে দেখলাম সমুদ্রতীর প্রায় জনশূন্য, বুঝলাম রাত অনেক হয়ে গেছে। ভারী মন নিয়ে আস্তে আস্তে হোটেলে চলে এলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়েছে। আমার খাবার বারান্দায় টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া রয়েছে। খুব ইচ্ছে না থাকলেও খেতে বসলাম। খেতে খেতে শুনলাম নিবারণবাবু মেয়েকে বলছেন—হোক রাত, তুমি বেড়াবে মা, হপ্তাখানেক বাদে দেখবে হার্টের কমপ্লেন একদম নেই।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তণিমা বললে—কাল আমায় খুব ভোরে ডেকে দিওতো বাবা, চক্রতীর্থ পর্যন্ত বেড়িয়ে আসব।

একটু পরে শুনলাম গিন্নীকে উদ্দেশ করে নিবারণবাবু বলছেন—'প্রথম প্রথম তণি একদম ঘরের বার হতে চাইত না—এখন দেখছি—রোজ সকাল বিকেল বেড়াবার কি উৎসাহ।' হাসবার কথা, কিন্তু হাসি পেল না। দুঃখ হল, মনে মনে বললাম—বেচারা নিবারণবাবু!

রাত্রে আর কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না—একটু তন্দ্রা এলেই ওদের প্রেমালাপগুলো পুঁজের মত সর্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে—এপাশ ওপাশ করে ঘণ্টাখানেক বাদে উঠে পড়লাম। অন্ধকার বারান্দায় তক্তাপোশের ওপর চুপ করে বসে রইলাম। কানে ভেসে আসছে শুধু সমুদ্রের একটানা গর্জন,—দেখলাম দু' একজন যেন অত রাত্রেও সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম—নিদ্রাদেবীর করুণা বর্জিত হতভাগ্য একা আমি নই শুধু, দরজায় তালা লাগিয়ে খালি পায়ে লুঙ্গি পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। নিচের বারান্দা অন্ধকার, আন্দাজে পথ চিনে বারান্দা পেরিয়ে

বাইরে যাবার সিঁড়িতে পা দিয়েছি কানে এল, 'কে যান ?' ব্রজ-দুলালবাবুর গলা। ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম—আপনি এখনও জেগে আছেন ?

অন্ধকারে উঠে বসে জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন ব্রজ-দুলালবাবু—'এত রাইতে যান কৈ ?' বললাম—কিছুতেই ঘুম আসছে না, ভাবলাম একটু সমুদ্রের ধারে ঘুরে এসে যদি—

বাধা দিয়ে ব্রজদুলালবাবু বলেন—'হ, সাধ্য কি ঘুমান! সকাল সন্ধ্যা যা সব কাণ্ড ঘটতে আছে, তা দেখ্যা শুইন্যা, ঘুম ত্যাশ ছাইড়্যা পলায়।' এক পা দু' পা করে হাঁটতে শুরু করলাম। ব্রজদুলাল-বাবু চিৎকার করে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, আমি আসতে আছি।' ব্রজদুলালবাবুকে সঙ্গী পেয়ে খুশি হলাম না মোটেই, অথচ ঐ ছিনে-জোঁকের মত লোকটাকে এড়িয়েই বা যাই কি করে ? একটু দাঁড়াতেই বিছানার চাদর গায়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন ব্রজদুলাল-বাবু। দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রজদুলালবাবু—'আচ্ছা, নিবারণবাবু লোকটি কেমন ?' মনে মনে বিরক্ত হলেও বললাম—'কেন, বেশ ভাল মানুষ বলেই ত মনে হয়।'

হো হো করে হেসে উঠে ব্রজদুলালবাবু বললেন—'ভাল মানুষ মানেই ত' বোকা!' চুপ করে আছি দেখে ব্রজদুলালবাবু বললেন—'আরে মশয়, বোকা না অইলে ঐ সোমত্ত ধিঙ্গি মাইয়ারে একলা রাইত নয়টা পর্যন্ত বেড়াইতে ছ্যায় ?'

বীচের বালির ওপর দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পুবদিকে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ কানে ভেসে এল বাঁশি, ঐ এক সুর—সকল দুখের প্রদীপ। আঁতকে উঠলাম—ভাবলাম এত রাতেও প্রদীপকুমারের প্রদীপ জ্বলছে ? ব্রজবাবু বালির ওপর বসে পড়ে বললেন—বসেন, আহা চমৎকার বাজায় তো ? বললাম—আপনি বসুন, আমি

আসছি। উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুব দিকে বাঁশির আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা গিয়ে দেখলাম, বালির ওপর নুলিয়াদের একখানা নৌকো কাত করে রাখা—তারই পাশ থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না—অন্ধকারটা একটু সরে গেলে উঁকি মেরে দেখলাম—বালির ওপর একটি মেয়েকে হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে প্রদীপকুমার। খানিক বাদে বাঁশি থামল—মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো প্রদীপকুমার—মেয়েটি নিচু হয়ে ঝুঁকে ওর চুলের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে আদর করতে শুরু করলো। অনিচ্ছায় মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—প্রদীপবাবু! দুজনেই চমকে উঠে দাঁড়াল—তারপর চোখের নিমেষে মেয়েটি একরকম ছুটে পুবদিকে বোধ হয় বি. এন. আর হোটেল মুখো চলে গেল। প্রদীপ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আবার ডাকলাম—প্রদীপবাবু শুনুন,! এক পা দু' পা করে কাছে এগিয়ে এসে প্রদীপ বললে—কে প্রদীপবাবু? আমার নাম জহর, আপনি ভুল করেছেন। বললাম—মোটেই না, পৃথিবীর লোকের কাছে আপনি যা খুশি পরিচয় দিতে পারেন—আমার কাছে আপনি প্রদীপকুমার, তা ছাড়া, আপনার সত্যি পরিচয় জানবার আগ্রহ বা কৌতূহল নেই আমার।

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

—আমি বলতে চাইছি, আর কতদিন ঘরে-বাইরে দুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে নির্বোধ মেয়েগুলোর সর্বনাশ করে বেড়াবেন?

বেশ একটু রেগেই বললে প্রদীপ—মানে?

বললাম—মানে এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কলকাতায় অচলা বলে একটি মেয়েকে চিনতেন? বেশ একটু ভড়কে গেল প্রদীপ, সেটা সামলে নিয়ে বেশ জোর দিয়েই বললে—কৈ না ত? বললাম

—আপনার মত কারবারি লোকের পক্ষে সব কথা মনে রাখা সম্ভব নয় জানি—তবুও মনে করিয়ে দিচ্ছি—অচলা, যাকে আদর করে ডাকতেন রানী। বাঁশির ইশারায় যাকে ডেকে নিয়ে যেতেন মেট্রো সিনেমায়। যেতেন কলকাতা থেকে দূরে ডাকবাংলায়—শেষ কালে যার চরম সর্বনাশ করে সারা জীবনটাকে বরবাদ করে অক্ষতদেহে সরে পড়েছেন। আর বলব ?

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বেশ বুঝতে পারলাম ভয়ে ওর মুখ পাংশু হয়ে গেছে। উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ।

বললাম—রাস্কেল, স্কাউনড্রেল—ভেবেছ সমাজে তোমাদের মত বিষফোড়ার দাওয়াই এখনও বার হয়নি—

হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল প্রদীপ—মুখ সামলে কথা কইবেন—।

বুক ফুলিয়ে অর্ধ অনাবৃত দেহটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—নইলে কি ? মারবে ? একবার চেষ্টা করেই দেখ না।

শুনেছিলাম ঐ ধরনের ছেলেগুলো বরাবরই সকলি কাউয়ার্ড হয়। দেখলাম হোলোই তাই, কোনও কথা না বলে মুখ নিচু করে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াল প্রদীপ। হুঙ্কার দিয়ে ডাকলাম—শোন ! ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল প্রদীপ। দু' পা এগিয়ে আরও কাছে গিয়ে বললাম—নিবারণবাবু আমার নিকট আত্মীয়। তণিমাকে তোমার ব্যথার পূজা থেকে বাদ দিলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে। আর একটা কথা কোনও দিন ভুল না—ওর সামান্য ক্ষতিও যদি কোনও দিন তুমি কর,—তাহলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও তোমার চুলের মুঠি ধরে আমি নিয়ে আসব। এটা আমার নিষ্ফল আস্ফালন নয়, নিছক সত্যি কথা।

কোনও জবাব না দিয়ে হন হন করে চলে গেল প্রদীপ।

এতদিনের জমে ওটা আকাঙ্ক্ষা আজ উৎস পেয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। মন অনেকটা শান্ত হল। তাড়াতাড়ি হোটেলের পথ ধরলাম। কিছুটা আসতেই কানে এল—এতক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে কি কথা কইছিলেন? বন্ধুলোক নাকি? বললাম—হ্যাঁ।

বালি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ব্রজদুলালবাবু বললেন—আমাদের হোটেলে আসবার লগে নিমন্ত্রণ করছেন নাকি?

বললাম—না। তারপর জোরে পা চালিয়ে দিলাম হোটেলের দিকে। পিছনে একরকম ছুটে আসতে আসতে ব্রজদুলালবাবু বললেন—কাল সকালেই ভদ্রলোককে হোটেলে লইয়া আসেন, খাসা বাঁশি বাজান আপনার বন্ধু।

ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। হাসি পেল আমার। ভাবলাম, আচ্ছা প্রদীপকুমারকে নিয়ে আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? ওকে শাসন করতে গেলাম আমি কিসের অধিকারে? হঠাৎ এতখানি পরোপকার প্রবৃত্তি আমার এল কোথা থেকে? নিজের মনকে প্রশ্ন করে চলি—উত্তর পেতেও দেরি হল না। বুঝলাম, ওসব বড় গালভরা অজুহাতগুলো নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়—সব কিছুর মূলে আত্মগোপন করে রয়েছে আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষা। আর শাসন করে ভয় দেখিয়ে কতদিন ওকে আমি দাবিয়ে রাখতে পারবো। হয়তো সামনের বছর দার্জিলিং বেড়াতে গেছি—ম্যালে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখলাম, আপাদমস্তক গরম ওভার কোট ও টুপিতে ঢেকে একখানা বেঞ্চের ওপর হেলান দিয়ে সুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে প্রদীপকুমার, আর অগুন্তি শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে পতঙ্গ স্বেচ্ছায় ছুটে আসছে পুড়ে মরবার জন্যে, তখন?

একটি ছোট্ট মিথ্যে কথা

ছোট্ট একটি মিথ্যে কথা, কিন্তু ফল তার যে কতো সুদূর প্রসারী ও বিষময়, তা আমি যেমন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি আর কারও ভাগ্যে ঠিক তেমনটি ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। স্থান কাল পাত্রের কথা বাধ্য হয়েই গোপন করে গেলেও ঘটনাটা কারও বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হবে না।

আমি ছবিতে কাজ করি, নায়ক অভিনয়ের খ্যাতি তেমন ছড়িয়ে না পড়লেও চেহারার সুখ্যাতি শত্রু মিত্র সবার মুখে মুখে, আর তারই জোরে একটার পর একটা ছবিতে নায়ক সেজে চলেছি।

বেলা এগারটা নাগাত স্টুডিও থেকে ফোন এল, পরিচালক নিজে বললেন, নতুন ছবিটার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছে, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে নামকরা অভিজাত বংশের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে মিস্ চম্পা রায়কে নায়িকার ভূমিকায় নামতে রাজী করান হয়েছে। আজ ঠিক বারোটায় তিনি স্টুডিওতে আসছেন রিহার্সালে, তুমি এখুনি চলে এস, গাড়ী পাঠাচ্ছি!

হাত থেকে টেলিফোন নামিয়ে থ' হয়ে বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ। এখানে বলে রাখা দরকার, তখনও ভদ্রঘরের শিক্ষিতা সুন্দরীরা স্টুডিওর গেট মাড়াননি—সিনেমায় নামবার কথা বললে নাক সিঁটকে উঠতেন, সেই সময়ের কথা; কাজেই মিস্ চম্পা রায় নায়িকার ভূমিকায় নামবেন শুনে অবাক্ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

শীতকাল। আলমারি খুলে সবচেয়ে দামী গরম সুটটা বার করছি, স্ত্রী এসে বললেন, একি ! ওটা বার করছ কেন ?

বললাম—স্টুডিওর রিহার্সাল আছে।

বেশ একটু অবাক্ হয়ে স্ত্রী বললেন—রিহার্সাল আছে বলে ঐ দামী কাচা সুটটা বার করছ ! বাইরে যে ছুটো সুট রয়েছে তাই পরে যাও না ? বললাম কিছুই বোঝ না, পরিচালক বলে দিয়েছেন সব চেয়ে দামী সুট পরে আসতে। হয়তো এইটে পরেই ছবিতে নামতে হতে পারে।

স্টুডিওর গাড়ী এসে গেল—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সত্যি। অপরূপ সুন্দরী চম্পা রায়! পাতলা দোহারা গড়ন, নাক চোখ মুখ স্পষ্ট ও টানা-টানা, গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং, বেশীক্ষণ চেয়ে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করে। পরিচালক আলাপ করিয়ে দিলেন, মিস্ রায় এই আমাদের হিরো —আর এগুতে পারলেন না তিনি, বাধা দিয়ে মিস্ রায় বললেন, ওঁর অত করে পরিচয় না দিলেও চলবে! ওঁর ছবি আমি ছু' তিন বার করে দেখি।

ধন্য হবার সৌভাগ্য জীবনে বড় বেশী হয়নি, আজ ধন্য হতে পেরে ধন্য হয়ে গেলাম। আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষ হতেই সেদিন কেটে গেল, ওরই মধ্যে এক সময় পরিচালককে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন মশাই ? উত্তরে তিনি শুধু হাসলেন—সে হাসির অর্থ হয়, পরিচালক হতে হলে অনেক কিছুই জানতে হয় ও করতে হয়।

রোজই ছুপুরে রিহার্সাল হয়, বিশেষ করে আমার আর মিস্ রায়ের। রোমান্টিক সিন বা লভ সিন আমাদের বাংলা ছবিতে হয় না বললেও অত্যুক্তি হবে না। আমাদের সবার ভয় ছিল

প্রথম নেমেই অমন একটা কঠিন সিন মিস্ রায় পারবেন কিনা, কিন্তু দু' একদিন যেতেই সবাই অবাক্ হয়ে দেখলুম লভ সিনের ব্যাপারে মিস্ রায় বেশ ফরওয়ার্ড। সত্যি কথা বলতে কি, আমিই যেন ওঁর কাছে আড়ষ্ট, জড়সড়। অন্যান্য সিনের মধ্যে একটা লভ সিনের খানিকটা টুকরো এখানে দিলাম। যতদূর মনে হয় সিনটা এই—

নাইট সিন, বোটানিক্যাল গার্ডেনে বা এই রকম নির্জন বাগানে, তারায় ভরা নীলাকাশের এক কোণে চাঁদ হাস্ছে, নিচে মাটিতে একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছি আমি, কাছে, খুব কাছে প্রায় গা ঘেঁষে বসে আছেন মিস্ রায়।

আমি—'তোমার গলায় পরাব বলে সারাদিন কথার মালা গেঁথে রাখি।' কিন্তু দেখা হলে সব ভুলে যাই, আমার নিজের অস্তিত্বও হারিয়ে ফেলি লিলি। আমার বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে এক হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে লিলি, অন্য হাতে মুখটা চেপে ধরে বলে,—চুপ, আজ কথা নয়, দেখছো না আকাশের চাঁদ, অগুন্তি তারা, নিচে নিঝুম প্রকৃতি সব চেয়ে আছে, কথা কইছে কেউ? মুখের কথাই কি সব? তোমার বুকের স্পন্দন, চোখের চাহনি এদের কথাই কি যথেষ্ট নয়?

অভিভূত হয়ে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি লিলিকে।

মোটামুটি সিনটা হল এই···একবার ভাবুন তো বাংলা ছবির নায়িকার পক্ষে এ কি ভয়ানক সিন! কিন্তু কেমন অনায়াসে মিস্ রায় ভূমিকাটি রিহার্সাল দিয়ে গেলেন—অভিনয় বলেই মনে হল না।

আজকাল রিহার্সাল শেষ করে বাড়ী ফিরতে রাত সাতটা আটটা বেজে যায়। সেদিন বাড়ী এসে কাপড় ছাড়ছি, স্ত্রী এসে কাছে দাঁড়ালেন। সত্যি কথা বলতে কি এ কদিন এক রকম স্ত্রীকে

অ্যাভয়েড করেই চলেছি—কি জানি যদি ধরা পড়ে যাই। আজ স্বীকার করতে লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই মিস্ রায় সাময়িক হলেও আমার মনের খানিকটা অংশ দখল করে বসেছিলেন। কাপড়-চোপড় ছেড়ে খুব টায়ার্ড হবার ভান করে শুয়ে পড়লাম, বিছানার এক ধারে চুপ করে বসলেন স্ত্রী—তারপর বললেন—আজকাল কী রিহার্সাল হয় তোমাদের এতক্ষণ ধরে ?

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—সে সব বুঝবে না তুমি, নতুন লোক নিয়ে কাজ করা যে কী ফ্যাসাদ, তোতা পাখীর মত শিখিয়ে দিলেও মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

স্ত্রী—তাহলে নতুন লোক নেওয়া কেন ? পুরোনো যারা রয়েছে তারা কি দোষ করল ? বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে বলি—তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কি দিন দিন কমে যাচ্ছে ! নতুন লোক নিলে টাকা কম লাগবে এটুকু বুঝতে পারো না ?

বোধ হয় বুঝতে পেরেই চুপ করে থাকেন স্ত্রী। একটু পরে বলেন, তা এরা সবাই কি নতুন লোক ? লোকী, মানে নতুন মেয়ে একটিও নেই এর মধ্যে ! থতমত খেয়ে যাই প্রথমটা, ভাবি জানতে পেরেছে নাকি ?

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হেসে সহজভাবে বলি—তোমার খালি ঐ এক চিন্তা স্টুডিওয়ে গিয়ে শুধু মেয়েদের নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই এই ত ?

তেমনি গম্ভীরভাবেই স্ত্রী বলেন,—কি জানি বাপু, আগে সাধলেও হেজলিন পাউডার সেণ্ট মাখতে না—এখন রোজ রিহার্সালে যাবার আগে ওগুলো তোমার না হলে চলে না। কতকগুলো হাড়হাবাতে নতুন লোককে পার্ট শেখাতে যে এত সাজগোজের দরকার হয়—জানতুম না।

কেস আমার ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ছে, ভাবলুম এখন নরম হলে চলবে না। বেশ উত্তেজিত হয়েই বললাম, তুমি বলতে চাও কি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় না ?

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন স্ত্রী—না, বিশ্বাস হয় না। তারপর হঠাৎ চাবি দিয়ে সশব্দে আলমারিটা খুলে দু'তিনটে গরম কোট টেনে বের করে তেমনি চড়া সুরেই বলতে লাগলেন,—চোখ থাকে ত দেখ, জামাগুলোর কলারে লিপষ্টিকের দাগ—আর আরও একটু কষ্ট করলে দেখতে পাবে বুক পকেটের কাছে হাত দেড়েক লম্বা সোনালি চুল কয়েক গাছি। এবার তুমি আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবে যে আজকাল তোমাদের স্টুডিওতে ব্যাটাছেলেরা ঠোঁটে লিপষ্টিক মাখছে আর মাথায় লম্বা চুল রাখছে, এই তো ?

এর পরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ও মর্মান্তিক। কোটগুলো সজোরে ছুঁড়ে দিলেন আমার মুখে, আমায় আর চেষ্টা করে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হল না, তারপর দম দম করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। গরম কোটের আড়ালে কতকক্ষণ আত্মগোপন করে ছিলাম ঠিক মনে নেই—তবে বেশ কিছুক্ষণ হবে।

দিন তিনেক হ'ল ছোট শ্যালক এসেছে বেড়াতে, ভাবলাম তাকে ডেকে চুপি চুপি খবরটা নেওয়া যাক। দু-তিনবার ডাকতেই ঘরে এল ছোট শ্যালক নয়, ছোট ভাই। বললাম,—তোর বৌদিকে একবার ডেকে দেতো ! অবাক্ হয়ে ছোট ভাই বললে,—বৌদি ত আধ ঘণ্টা হল তাঁর ভাইকে সঙ্গে করে বাপের বাড়ী চলে গেলেন—বললেন, মার খুব অসুখ, তুমি যেতে বলেছ।

চোরের মার কান্না, বললাম, ও হ্যাঁ, ঐ রকম বলছিলো বটে, তা রাত্রে না গিয়ে কাল সকালে গেলেই হোতো।

কোনও কথা না বলে ছোট ভাই চলে গেল। এতক্ষণে বুঝতে

পারলাম ব্যাপারটা খুব জটিল—কিন্তু আমার নাগালের বাইরে। এ যেন আমার পেটও ভরলো না, জাতও গেল।

কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা—কিন্তু আমার দাম্পত্য জীবনের একটা মোটামুটি বোঝাপড়ায় ফিরে আসতে লেগেছিল পুরো ছ'টি মাস। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওসব ছোটো খাটো ব্যাপারে আর কখনই মিথ্যে কথা বলব না। এখন থেকে মারি ত গণ্ডার, ওসব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা, কখনই না।

আমার বনো বাগান

কথায় আছে, 'কারো সর্বনাশ কারো পোষমাস', আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—কিন্তু তাতে আপনাদের কি যায় আসে? আমার এ দুঃখের কাহিনী শুনে, সামান্য একটু সান্ত্বনা বা সমবেদনা দূরে থাক্ —শেষ পর্যন্ত আপনারা যে ব্যঙ্গের হাসি হাসবেন—তাও জানি। বলবেন, তবুও কেন এসব লিখছি। কারণ আছে।

ধরুন, আপনার সবচেয়ে প্রিয়জনের বিয়োগে আপনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন—যাকে মরজগতে ধরে রাখবার জন্য আপনি চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি কিন্তু সবই বৃথা হয়েছে, তখন সামান্য একজন পরিচিত লোকের দেখা পেলেই আপনি মনের রুদ্ধ দ্বার খুলে হাউমাউ করে—ঐ প্রিয়জনের প্রশংসা ও স্তুতিগানে মুখর হয়ে উঠবেন—যদিও মনে মনে বেশ জানেন যে তাতে বুকের ভার একটু লঘু হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভই হবেনা—নয় কি? আমারও অবস্থা ঠিক তাই। যাক—যা বলছিলাম।

দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে তুলনা না করলেও বিশ-পঁচিশ বছর আগেও যে গভীর জঙ্গল ছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ এখনও দরকার হলে দিতে পারি, কিন্তু কোন লাভ নেই। সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও, নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোর নির্দেশ এড়িয়ে সে ছিল আদিম বর্বর যুগের রক্ত পতাকার মত—স্বতন্ত্র, আপনার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল কিন্তু ভয়াবহ।

ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি অসূর্যম্পশ্যা—একে দেখার পর থেকেই কথাটার মানে আরও প্রকট হয়ে উঠলো। আলো

হাওয়ার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই, মানুষ তো দূরের কথা, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীও তার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেতো। এ যেন বহু-দিনের ভুলে যাওয়া দুর্বোধ্য ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার একটা টুকরো, ঝড়ে উড়ে এসে ভিক্টোরিয়ার মর্মর সৌধের চূড়ায় আটকে—আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ফুল ভালবাসি, একটু অবসর পেলেই ফুলের বাগান করবার বাসনা প্রবলভাবে মনের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দেয়– কিন্তু অভিভাবকের কড়া শাসন—'পড়াশুনো ছেড়ে রাত দিন ফুল আর ফুলের বাগান, বড় হয়ে মালী হবি নাকি ?' মনের সাধ মনেই গুমরে মরতে থাকে। সুযোগ এলো কুড়ি একুশ বছর বয়সে, অভিভাবকদের শাসনের বল্গা তখন অনেকটা ঢিলে হয়ে এসেছে। ভাবলাম এইবার।

সেই মূর্তিমান অনিয়মকে নিয়মের গণ্ডির মধ্যে এনে লেগে গেলাম একলব্যের মত কঠোর সাধনায়। ঐ ভয়াবহ জঙ্গলকে আমি করে তুলবো নয়নাভিরাম ফুলের বাগান। সে যে কি কঠিন কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। আহার নেই, নিদ্রা নেই, রাতদিন আমার ধ্যান হয়ে দাঁড়ালো—আমার সাধের বাগান। আমারও পণ হয়ে দাঁড়ালো—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। দেখলাম সত্যিকার সাধনায় সিদ্ধি আছেই—আমারও বাঞ্ছিত সিদ্ধি একদিন নেমে এলো—কী আনন্দ !

লোকে ধন্য ধন্য করল—'এমনি না হলে ফুলের বাগান! কত অযাচিত প্রশংসা যে পেলাম তার ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টির গর্বে আনন্দে বুকটা দশ হাত না হলেও কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেলো—ভাবলাম, আর দিয়া, হায়রে……।

বাগানে একধারে সরু অপরিসর একটা রাস্তা, দুধারে তার

চোখ জুড়ান ফুলের গাছের সারি—যখনি সময় পাই পরিচর্যায় লেগে য়াই, কেমন একটা নেশায় সব সময় যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। দিন মাস বছর ঘুরে ঘুরে দীর্ঘ পনের ষোলো বছর কেমন করে যে কেটে গেল বুঝতে পারিনি।

দেশে দেশে তখন আমার বাগানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, যে সে আমার বাগানের অনুকরণ করতে শুরু করেছে—দেখে শুনে গর্বে আনন্দে রাতদিন মশগুল হয়ে থাকতাম। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত চেয়ে দেখলাম, আমার এতো সাধের বাগান কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলাম কয়েকটি ফুলের গাছ কে যেন অদৃশ্য নির্মম হাতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। সর্বনাশের শুরু সেই দিন থেকে —সে দিনের কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।

এর পরের ইতিহাস যেমন মর্মান্তিক তেমনি দ্রুত। ঐ ছোট্ট অপরিসর পথ কে যেন দিন দিন বড় করে তুলতে চাইছে—তার চারপাশের গাছগুলোকে নির্দয় হাতে উপরে ফেলে দিয়ে, আমার সতর্ক ও সজাগ চোখের উপর দিয়েই সেই অদৃশ্য শত্রু তার ধ্বংসের খেলা শুরু করে দিল। ভাবতেও কান্না পায়।

বন্ধুরা সান্ত্বনা দেয়, বলে—'ভয় কি, আজকের বিজ্ঞানের যুগে এই সব ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে মিছে মাথা ঘামাস্‌নে—একজন বিশেষজ্ঞকে দেখা—নিশ্চয় জমিতে কোনো দোষ হয়েছে।' তথাস্তু। নিজের বিচারবুদ্ধি কিছু নেই, যে যা বলে তাই করতে শুরু করে দিলাম, কত টাকা যে জলের মত বেরিয়ে গেলো তার হিসেব রাখিনি।

এম্‌নি করে পাঁচ ছ' বছর কাটলো—কিন্তু হায় কিছুতেই কিছু হোলনা—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে না গেলেও লণ্ডভণ্ড

়য় গেলো। তার দিকে তাকালে আজ আমার চোখ ফেটে জল াসে। শুধু মনে হয়, তৃণ-গুল্মহীন মাঠে ঝড়ে ডালপালা মুড়িয়ে ওয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গাছের প্রেতাত্মা, ভীরু চোখে ড়িয়ে, মানুষের অনুকম্পার দুয়ারে বৃথাই মাথা খুঁড়ে তাদের পহাস ও ব্যঙ্গের খোরাক যোগাচ্ছে।

রাতে স্বপ্ন দেখি,—আমি যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে াছি, ঐ সর্বস্বান্ত ভীরুর দল, এক এক করে এসে, আমার দিকে াঙুল বাড়িয়ে যেন দুনিয়ার দরবারে নালিশ জানায়,—'এই, এই াই অর্বাচীন, এরই জন্যে আমাদের এই দুর্দশা, আজ আমরা কলের উপহাসের পাত্র।' আরও কত কি—ঘুম ভেঙে যায়, উঠে ায়চারি শুরু করে দিই। এ অবস্থা আর কিছুদিন চললে আমি াগল হয়ে যাবো, নয়তো ঐ অবশিষ্ট জ্যান্তমরা গাছগুলোকে ়জের হাতে উপড়ে ফেলে মরুভূমি করে দিয়ে যে দিকে দুচোখ ায় চলে যাবো। আত্মহত্যা করতে পারবো না, সে সাহস নেই।

এখনও যদি বুঝতে না পেরে থাকেন আমার কি সর্বনাশ হয়ে াছে, তাহলে বুঝবো আপনারা আমার এ দুঃখের কাহিনী মন দিয়ে ানেন নি।

আমার মাথায় টাক পড়ে গেছে।

STATE CENTRAL LIBRARY W.B
Road. Calcutta